ডেভিড কপারফিল্ড

॥ চার্লস ডিকেন্স ॥

সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
আশিসকুমার সরকার
১/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

DAVID COPPERFIELD
by Charles Dickens
Translated by DINESH GANGOPADHYAY

দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৭০

মুদ্রাকর :
মণীন্দ্রমোহন বসাক
সারদা প্রেস
১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯


উপহার



চার্লস ডিকেন্স

[১৮১২-১৮৭০]

অমর ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কেরানী। ঋণের দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন। দুর্গত পরিবারের সন্তান চার্লসকে শৈশবেই শ্রমিক-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়; বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভও অধিক অগ্রসর হয় নাই।

সতেরো বৎসর বয়সে ডিকেন্স সংবাদপত্রের রিপোর্টারের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর প্রথম ঔপন্যাসিক প্রয়াস 'স্কেচেজ বাই বজ' ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা আনে। তাঁর কালজয়ী রচনাগুলির মধ্যে "ডেভিড কপারফিল্ড" একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এটি যখন প্রথম (১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয় তখন তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করে।

প্রথম অধ্যায়

১

ইংলণ্ডের সাফোক অঞ্চলে ছবি-ছবি একটি গ্রাম। নাম ব্লাণ্ডারস্টোন। সেখানেই কোনো এক শুক্রবারে রাত বারোটায় আমার জন্ম।

ছেলেবেলার অনেক স্মৃতিই আজ অস্পষ্ট। কেবল আমার মায়ের মুখখানি মনের মধ্যে আজও জ্বলজ্বল করছে। রেশমের মতো কি সুন্দর একরাশ সোনালি চুলের গুচ্ছ আর যৌবনের কোমল লাবণ্যে ভরা ছিপছিপে শরীরটি। মনে পড়ে আমাদের পুরোনো ঝি পেগটিকে। দিব্যি গোলগাল, বেঁটেখাটো মানুষটি। ফুলো-ফুলো দুটি লালচে গাল, টোকা দিলেই যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে। খেটে-খাওয়া মানুষটির মতো শক্ত শক্ত হাত-পা। মনটি ভারী নরম।

চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই এক-বুক উঁচু কাঠের বেড়া-ঘেরা আমাদের সেই সুন্দর বাড়িটি। সামনে রাস্তা, পেছনে ফুলবাগান। ফুলে ফুলে আলো করে আছে বাগানখানা। ফুরফুর করে উড়ছে প্রজাপতি, মিষ্টি সুরে গান গাইছে পাখি, শোবার ঘরের জানালা দিয়ে ভুরভুর করে আসছে মন মাতানো গন্ধ। বাগান-ঘিরে ফলের গাছ। রসে ভরা নানা ফলে গাছগুলি টইটম্বুর।

কি সুখেই না ছিলাম সেখানে! মায়ের আদর, পেগটির যত্ন, সকাল-বিকেল বাগানের সবুজ ঘাসে ছুটোছুটি, গাছে ঝোলানো আরামী দোলনায় বসে দোল খাওয়ার মজা, রাতে শুয়ে শুয়ে মায়ের মুখে মিষ্টি ঘুমপাড়ানি গানের আমেজ আর ঘুমের আগে কপালের উপর তাঁর ভিজে-ভিজে, নরম ঠোঁট দুখানার মৃদু স্পর্শ আজও যেন জীবন্ত হয়ে আছে মনে।

মায়ের গায়ে সর্বদাই থাকতো একটি সুন্দর গন্ধ। কাছে এলেই ঘরময় সেটি ছড়িয়ে পড়ত। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যেন একেবারে আমার

বুকের ভেতর গিয়ে পৌঁছোতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মনে হতো আমি যেন তারই মধ্যেই ডুবে আছি।

শীতকালে যখন তুলোর মতো বরফ পড়তো, বাইরে বেরিয়ে ছুটপাট করবার জো'টি থাকত না একদম, সন্ধ্যেবেলায় বসবার ঘরের গালচের উপর শুরু হতো আমার লাফালাফি। মা বকুনি দিতেন মাঝে মাঝে, পেগটি এসে আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে সোফার এক কোণে বসে গল্প শোনাতো। আরাম কেদারায় গা এলিয়ে মা বিশ্রাম করতেন, চুল বাঁধতেন। ধবধবে দুটি সাদা হাত দিয়ে, ঘাড়খানা অল্প বেঁকিয়ে ঘন চুলের মধ্যে চিরুণি চালাতেন। তখন তাঁকে হুবহু সেই রূপকথার রাজকন্যের মতো মনে হতো।

কিন্তু এ সুখ বেশিদিন রইল না। মনে আছে এক শীতের রাত্রে মা বাড়ি নেই, আমি আর পেগটি বৈঠকখানায় আগুনের ধারে বসে আছি, আমি আমার নতুন কেনা পড়ার বইখানা পড়ছি আর গালে হাত রেখে চোখ দুটি আধবোজা করে পেগটি তাই শুনছে, হঠাৎ ক্রিং করে বাইরের কলিংবেলটি বেজে উঠলো।

এক ছুটে গিয়ে আমি দরজা খুলে দিলাম। নিশ্চয়ই মা। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। কিন্তু তাঁর পেছনে ঐ নতুন ভদ্রলোকটি আবার কে? তাঁকে তো চিনি না। বেশ সুন্দর চেহারার লম্বা-চওড়া মানুষটি। একমাথা চকচকে কালো চুল, দর্শনধারী একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ, কেমন যেন চেনা-চেনা গোছের। হঠাৎ মনে পড়লো গত রবিবার ইনিই গির্জা থেকে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিলেন। সাজ-পোশাকে মা আমার সর্বদাই শৌখিন। কিন্তু আজ যেন আরো ভালো করে সেজেছেন। আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে।

আমি হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। মা নীচু হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভদ্রলোকও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। কেন জানি না, লোকটিকে আমার একটুও

ভালো লাগছিল না। বিশেষ করে যাবার সময় তিনি যখন আমার মায়ের হাতখানা ধরে বললেন 'চলি', কেমন যেন একটা হিংসায় আমার বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠলো।

কিন্তু আমি পছন্দ করি আর না-ই করি, ভদ্রলোকের আসা-যাওয়া বন্ধ হলো না। শেষে এমন হলো যে, প্রায় রোজই তিনি আসতে লাগলেন আর মায়ের সঙ্গে নিরিবিলি গল্প-গুজবও তাঁর বেড়েই চললো।

এইভাবেই কয়েক মাস কাটলো। শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে। ভোর বেলায় রাস্তার ধারে আমি খেলা করছি, মা লন-এ তাঁর সেলাই নিয়ে বসেছেন, হঠাৎ দেখি সেই ভদ্রলোক, সাত-সকালে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দোরগোড়ায় এসে হাজির। তাঁর নামটা এর মধ্যেই আমি জেনে ফেলেছিলাম। মা তাঁকে মিস্টার মার্ডস্টোন বলে ডাকতেন। ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

তিনি বললেন, 'এই কাছেই। লোস্টফ্‌ট্‌ বলে একটি জায়গায়। একদম সমুদ্রের ধারে। সেখানে আমার একজন বন্ধু থাকেন। যাবে তো চলো। তোমায় দেখিয়ে আনি।'

একবার ভাবলাম যাব না, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে যাওয়ার লোভে রাজী হয়ে গেলাম। হাসিমুখে বললাম, 'চলুন।' মায়ের দিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন, তারপরই হাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন।

জায়গাটি সত্যি সুন্দর। আমরা সমুদ্রের পাড়ে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বৈঠকখানায় জাঁদরেল গোছের দুটি ভদ্রলোক বসে চুরুট টানছিলেন, আমাদের দেখে একজন বলে উঠলেন, 'আরে মার্ডস্টোন যে! সঙ্গের ছেলেটি কে?'

মার্ডস্টোন বললেন, 'এটি হচ্ছে ডেভিড। ডেভিড কপারফিল্ড।'

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসলেন, 'ও সেই সুন্দরী বিধবাটির ছেলে, যাকে তুমি —' কথা শেষ হবার আগেই মার্ডস্টোন চোখ দিয়ে তাঁকে ইশারা করলেন। তিনিও চুপ করে গেলেন। কেবল আমার দিকে চোখ রেখে মিটমিটিয়ে হাসতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন গোলমেলে ঠেকলো। অনেক ভেবে-চিন্তেও আমি কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

সন্ধ্যের পরই আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। আওয়াজ পেয়েই মা গেট-এর কাছে ছুটে এলেন। মার্ডস্টোন আমাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়েই মা'র হাতখানা নিজের মুঠোর ভেতরে তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভারী খারাপ লাগছিল আমার। কিন্তু ঘরে ঢুকেই মা ওখানকার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কথায় কথায় আমি একটু বিরক্তির সঙ্গেই হোটেলের ঐ ভদ্রলোকের কথা-কয়টিও মাকে বলে ফেললাম। মার্ডস্টোন সাহেবের চোখের ইশারা, তাঁর চুপ করে যাওয়া, আমার দিকে চেয়ে মিটির মিটির হাসি—কিছুই বাদ দিলাম না। ভেবেছিলাম শুনে মাও বিরক্ত হবেন, কিন্তু না। বরং তাঁর চোখে-মুখে একটা চাপা খুশির ভাবই যেন ফুটে উঠলো। সত্যি কথা বলতে কি, মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

মাস দুই পরে একদিন পেগটি আমাকে বললো, 'দাদাবাবু, দিন কয়েকের জন্য একটু দেশে যাচ্ছি। চলো না আমার সঙ্গে। কয়েক-দিন ঘুরে আসবে।'

আমি বললাম, 'কোথায় ?'

সে বললো, 'ইয়ার মাউথে। সেখানে আমার ভাইরা থাকে। চমৎকার জায়গা। গেলে আর আসতে চাইবে না তুমি। সেখানে আছে অঢেল রোদ আর আকাশ-ছোঁয়া নীল সমুদ্দুর। নৌকো,

জাহাজ, জেলে-ডিঙিতে চেপে মস্ত মস্ত ঢেউয়ের দোলায় তুলতে তুলতে জেলেদের মাছধরা দেখলে একদম অবাক হয়ে যাবে তুমি। আর আছে আমার ভাইপো হ্যাম। বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড় কিন্তু ছেলেমানুষিতে তোমারই জুড়িদার। তার সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে রূপোলি বালুতে খেলা করবে তুমি।

মনে মনে ভাবলাম, কি মজা! কিন্তু মা? বললাম, 'আমি চলে গেলে একা একা মা কি করে থাকবেন!'

পেগটি বললো, 'সেজন্য কিছু ভেবো না তুমি। মা তো আর এখানে থাকছেন না! দিন পনেরোর জন্য তাঁর বন্ধু মিসেস গ্রেপারের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন।'

—'তাই নাকি? কিন্তু মা তো সে কথা আমাকে একবারও বলেননি!' প্রচণ্ড অভিমানে হঠাৎ যেন আমার দুচোখ ছলছল করে উঠলো। পেগটি বললো, 'বলবেন কি? নেহাৎ না গেলে নয় তাই যাচ্ছেন। তোমাকে ছেড়ে কি করে যাবেন, কেমন করে থাকবেন, দিনরাত সেই ভাবনায়ই তো তাঁর মন খারাপ। বলি বলি করেও কথাটা তোমায় বলতে পারছেন না।'

শুনে মনটা আবার হাল্‌কা হয়ে গেল। তাই নাকি? তা বেশ তো! ঘুরেই আসুন না মা। কয়েকটা দিন বইতো নয়। আমি বরং ইয়ার মাউথটাই বেড়িয়ে আসি এই ফাঁকে। পেগটিকে কথা দিয়ে ফেললাম, 'যাবো'।

দুদিন পরেই আমরা রওনা হলাম। মা গেট পর্যন্ত ছুটে এলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বার বার আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে চুমো খেতে লাগলেন। পেগটিকে বললেন সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রাখতে, এক মুহূর্তও চোখের আড় না করতে। কতদিন পরে মা'র বুকের সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছি! এমনভাবে আদর খাচ্ছি! হঠাৎ মূর্তি আপদের মতোমান্

মিস্টার মার্ডস্টোন সেখানে এসে উদয় হলেন। সামান্য কয়েকটা দিনের ছাড়াছাড়িতে কান্নার এমন আদিখ্যেতার জন্য মাকে বেশ মিঠে-কড়া গোছের একটু ধমকানি দিলেন। মাও কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন। ইচ্ছে হচ্ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার গালে ঠাস করে একটি চড় কষে দিই। কিন্তু মনের রাগ মনে নিয়েই মুখ বুজে গাড়িতে উঠতে হলো। পাশে বসা পেগটির দিকে চাইলাম। দেখলাম তারও মুখখানা কেমন যেন একটা অশুভ ভাবনায় থমথমে। সে কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে আমার মাথাটি তার কোলের মধ্যে চেপে ধরে গুম হয়ে বসে রইলো। গাড়িটা ততক্ষণ চলতে শুরু করেছে।

২

আমরা একটি নদীর ধার দিয়েই চলেছি। সামনেই সমুদ্র। নদী না বলে এটিকে সমুদ্রের খাঁড়ি বলাই ভালো। এরই মোহনায় বিস্তৃত বেলাভূমির উপর ইয়ার মাউথ। জায়গাটি সত্যি মনোরম। চারদিক্ খোলা। হু-হু করছে বাতাস। গাড়ি থেকেই দেখতে পেলাম সামনে কিছুদূরে বালিয়াড়ির ধারে পুরোনো একটি সরাইখানা। তার দরজায় হ্যাম আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে। ছোকরা যেমন জোয়ান তেমনি লম্বা। ছ'ফুটের কম হবে না। কিন্তু মুখখানি একেবারে ছেলেমানুষের মত। পনেরো-ষোল বছরের এমন শরীর! বোধহয় এখানকার জলহাওয়ার গুণেই।

গাড়ি থামতেই সে আমাকে টুক্ করে তার পিঠে তুলে নিল, তারপর বাক্সটা বগলের নীচে গলিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। ছোট

আর একটা বাক্স হাতে পেগটি তার পিছু পিছু এগোতে লাগলো। পিঠে চড়ে যেতে আমার ভারী মজা লাগছিলো। সামনে বালিয়াড়িটা ঢালু হয়ে সমতলে গিয়ে নেমেছে। ওদিকে আঙুল তুলে হ্যাম বললো, 'এসে গেছি। ঐ তো আমাদের বাড়ি।' আমি কিন্তু ফাঁকা বালু ছাড়া বাড়িঘরের কোনো চিহ্নই কোথাও দেখতে পেলাম না।

সামনে সমুদ্র গর্জন করছে। ঢেউগুলো পাড়ের বালুতে এসে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। পরে মনে হলো, সমুদ্রের প্রায় কোলের কাছেই আলকাতরা মাখানো বেশ বড়সড় একখানা নৌকো যেন ডাঙার ওপর বসানো রয়েছে। তার চারদিকে কাঠের চাল। চালের মাথায় একটি চিমনিও বসানো হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে দিব্যি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমি হ্যামকে বললাম, 'বাড়ি কই ? ও তো দেখছি ডাঙায় তোলা একখানা নাও। হ্যাম বললো, 'হ্যাঁ খোকাবাবু, বাড়ি বলো ঘর বলো, ঐটিই আমাদের আস্তানা।'

গল্পে আলাদীনের রাজপ্রাসাদের কথা পড়েছিলাম, পড়েছিলাম বক-পাখির ডিমের কথা। কল্পনার সে সব জিনিস হঠাৎ চোখের সামনে দেখলেও অতটা খুশি হতাম না—যতটা সে মুহূর্তে হলাম, স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত আর সুন্দর ঐ নৌকো-নিবাসটি দেখে। এর থেকে আশ্চর্য কিছু যেন ভাবাই যায় না।

দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে একটি মহিলা। যেমন মিষ্টি মুখখানি তেমনি মিষ্টি তার কথা। পরনের ধবধবে শাদা পোশাকটি চারদিকের ফুটফুটে শাদা বালির উজ্জ্বলতায় মিশে যেন আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো। তিনি একা নন। তাঁর পেছনে আরও একটি ছোট্ট মেয়ে। গলায় চকচকে নীল পুঁতির মালা। টুকটুকে রাঙা মুখে যেমন আশ্চর্য তাকে দেখতে, তেমনি অসম্ভব লাজুক। হ্যামের পিঠ থেকে নেমেই আমি ওকে ছোট বোনের মতো কপালে চুমু দিয়ে

আদর করতে গেলাম, কিন্তু করবো কি। তার আগেই একছুটে সে ওখান থেকে কোথায় যে উধাও হলো কে জানে?

নৌকোর ভেতর তিনখানা কামরা। একটিতে খানা-পিনা হয় আর ছটিতে ওরা শোয়। ঘরগুলো ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রের খোলা হাওয়া অবিশ্রান্ত ভেতরে এসে ঢুকছে। দেয়ালে সুন্দর রঙ করা, একধারে হুকে আটকানো কয়েকটি জালের দোলনা। রাত্রে ওগুলো টাঙিয়ে নিয়ে দিব্যি আরামে ওরা ঘুমোয়।

নায়ের একেবারে পেছনে, হালের উঁচু দিক্‌টায় আর একটি ছোট্ট খোপের ঘর। ফিকে সবুজ দেয়ালে ঝকঝকে ঝিনুকের ফ্রেম বসানো একটি সুন্দর আয়না। আয়নার পাশেই একটি জানালা, আর তার নীচেই কাঠের পাটাতনের ওপর দিব্যি নরম-সরম একটি পরিষ্কার বিছানা। মাথার কাছে কাঠের কুলঙ্গিতে ফুলদানি। এক গোছা রঙিন বুনোফুল সেখানে মিষ্টি হাওয়ায় ছুলছে। বুঝলাম এই ঘরখানাই তারা বিশেষ করে আমার জন্য সাজিয়ে রেখেছে। আমারও যে কি ভালো লাগছিল! কোথায় লাগে সাতমহলা রাজবাড়ি!

খাওয়া-দাওয়াটিও হলো বেশ যুৎসই। মনে হলো এমন স্বাদে-সোয়াদে যেন বাড়িতেও বিশেষ খাইনি। পেগটি সর্বদা আমার কাছে-কাছেই রয়েছে। ভাবখানা যেন তার গরিব ভাইয়ের গরিব-খানায় আমার মতো বড়ঘরের দাদাবাবুর কত কষ্টই হচ্ছে!

খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি ফিরলো ওর ভাই, মিস্টার পেগটি। অবিকল ওরই মতো গোলগাল মানুষটি। গায়ে লোম একটু বেশি, কিন্তু মুখখানায় সর্বদাই একটি মিষ্টি মোলায়েম হাসি মাখানো। ঘরে ঢুকেই সে বললো, 'ওরে বাবা, গরিবের ঘরে হাতির পা! কোনো কষ্ট হচ্ছে নাতো স্যার?'

'স্যার' শুনে কেমন যেন লজ্জা লাগছিলো আমার। মুখখানা কাচুমাচু করে বললাম, 'না, না, তোফা আরামে আছি আমি।'

সে বললো, 'আমরা হলাম গিয়ে পাড়াগেঁয়ে লোক। চাল-চুলো-হীন। তোমাদের মতো খোকনবাবুদের যত্ন-আত্তি করতে পারি এমন সাধ্যি নেই। তবু কি যে আহ্লাদ হয়েছে পেগটির সাথে তুমিও এসেছ বলে।'

আমি বারবার তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'আপনি কিছু ভাববেন না। নিজের বাড়ির মতোই এখানে আমি আনন্দে আছি।'

এক মিনিটেই লোকটির সাথে মিশে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে চললো গল্প। শুনলাম ঐ ছোট মেয়েটির নাম এমিলি। সে আর হ্যাম তার নিজের ছেলে-মেয়ে নয়। উনি নিজে বিয়ে-থা করেননি। ওরাও দুজনে আপন ভাই-বোন নয়। ছোট বেলায় দুজনেরই বাপ-মা মারা গেলে নিরাশ্রয় বাচ্চাদুটিকে উনি পুষ্যি নেন। সেই থেকে নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই ওদের মানুষ করছেন।

শাদা পোশাকে যে মহিলাটিকে দেখেছিলাম তিনিও এঁদের কেউ নন অথচ এখন এ পরিবারেরই একজন হয়ে গেছেন। তাঁর নাম মিসেস গামিজ। ওঁর স্বামীও এঁর সঙ্গে একই নৌকোয় মাছ ধরার অংশীদার হিসেবে কাজ করতো। কিছুদিন আগে খুব দুস্থ অবস্থায় হঠাৎ মারা যায়। সেই থেকেই মিস্টার পেগটি নিজের বোনের মতো তাঁকেও এখানে এনে আশ্রয় দিয়েছেন।

শুনে লোকটির উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। এমন মানুষ সংসারে ক'টা পাওয়া যায়?

রাতে সেই আরামপ্রদ বিছানাটিতে শুয়ে সমুদ্রের বিচিত্র গর্জন শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কিছুই মনে নেই। সকালে উজ্জ্বল রোদের আলো মুখে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে দেখি ঘন নীল সমুদ্রের পাড়ে ঝড়ের মতো হাওয়া বইছে আর ছোট্ট এমিলি ছুটোছুটি করে রঙ-বেরঙের ঝিনুক কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করছে। আমিও ওর সাথে ভিড়ে গেলাম। উড়ন্ত এলোচুলে ওর

সেই ঝিনুক কুড়োনোর ভঙ্গী দেখে ওকে বললাম, 'আরে, তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে পাকাপোক্ত নাবিক হয়ে উঠেছো একেবারে!'

সে বললো, 'তা আর পারলাম কই? সমুদ্রকে এখনো আমার বড় ভয় করে।'

আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। আমার কিন্তু একদম ভয় করে না।'

এমিলি বললো, 'না, করে না আবার! জানো, সমুদ্র কত নিষ্ঠুর! ওর মধ্যে একবার ডুবে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।'

আমি বললাম, 'তুমি এখনো ছেলেমানুষ, তাই এত ভয় পাও। কিছুদিন যাক্, যখন পুরোদস্তুর একটি মহিলা হয়ে উঠবে তখন আর···'

কথা শেষ করতে দিল না সে। ফস্ করে বলে উঠলো, 'সে তো এক্ষুণি আমার ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, তুমি আমি সব্বাই এক নিমেষে একেবারে হ্যাম-এর মতো জোয়ান আর বড় হয়ে উঠি, তা হলে ঝড়ের দিনেও সমুদ্রকে আর ভয় পাবো না আমরা, কি বলো? আমি শুধু আমাদের জন্যেই বলছি না, কত গরিব জেলেরা মাছধরার আশায় ছোট-ছোট ডিঙি নিয়ে অনেক দূর অবধি এর বুকে পাড়ি দেয়। যদি কেউ কখনো কোনো বিপদে পড়ে তখন আমরা তাদের বাঁচাতে পারবো। যদি সমুদ্র কাউকে ডুবিয়েও মারে, আমরা সে বেচারার অসহায় পরিবারকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো।'

ছোট্ট এমিলির মুখে বড়দের মতো এমন দরদী কথাগুলো শুনে আমার চোখ কেন যেন হঠাৎ ছলছল করে উঠলো। মানুষের জন্য অগাধ মায়ায় ভরা কি সুন্দর ওর মন।

এমনি করেই হাসি-খেলায়, গাল-গল্পে পনেরোটি দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এবার বাড়ি ফিরে যাবার

পালা। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছিল এমিলির জন্যই। এখনও মনে পড়ে. গাড়িতে উঠে ঝরঝর করে ওর জন্যে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। সেই ছোট বয়সের ছোট্ট সাথী, দুদিনের দেখা এমিলিকেই বোধহয় জীবনে মায়ের পরে আমি সবচেয়ে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি। দূর থেকেই গেটটা চোখে পড়ছে, কিন্তু দোরগোড়ায় মাকে দেখতে পাচ্ছি না। এমন তো কখনো হয় না! তবে কি মা এখনও ফিরে আসেননি? মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। পেগটি বললো, 'হয়তো কাজে-কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন, নীচে নামতে পারেননি।' কিন্তু সে কথায় মন ভরলো না। দুঃখে অভিমানে কেমন যেন চোখ ভরে জল এসে গেল। পেগটিরও মুখখানা কেমন যেন থমথমে। যা হোক, বাড়ি এসে পৌঁছুলাম। তখনও মা'র দেখা নেই। দোর খুলে দিল একটি নতুন চাকর। জন্মেও তাকে আর কখনো দেখিনি, তার মুখের দিকে না তাকিয়েই পেগটি আমাকে নিয়ে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো; তারপর দোর বন্ধ করে দিলো। বাড়িটায় যেন কোনো সাড়াশব্দ নেই। একদম চুপ-চাপ। আমার গা ছমছম করছিলো।

ভয়ে ভয়ে পেগটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি পেগটি? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!'

সে আমার গায়ে হাত বুলোতো বুলোতো কেমন যেন বিদঘুটে গলায় বললো, 'ব্যাপার আবার কি? খুব ভাল। তোমার একটি নতুন বাবা এসেছেন।'

'অ্যাঁ!' কথাটা শুনেই আমি যেন হঠাৎ চমকে উঠলাম। আমার মুখখানা শাদা হয়ে গেল। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখদুটি জলে ঝাপসা হয়ে গেলো।

পেগটি হাত বাড়িয়ে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিলো। বললো, 'ছিঃ, অমন করতে নেই। চলো তাঁকে দেখে আসি।'

আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম, 'না, না, আমি যাবো না, আমি তাকে দেখতে চাই না।'

পেগটি বললো, 'তাঁকে না হলেও মা'র কাছে তো যেতেই হবে।'

গিয়ে দেখি আমাদের সেই সুন্দর বৈঠকখানা ঘরটিকে যেন আর চেনাই যায় না। আসবাবপত্র নাড়াচাড়া করে তাকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আগুনের চুলোর কাছে একটি নরম সোফায় দিব্যি সেজেগুজে মা বসে আছেন। তার পাশে মিস্টার মার্ডস্টোন।

ফিসফিসিয়ে পেগটি বললো, 'এই তোমার বাবা।'

আমাকে দেখেই মা হাসিমুখে উঠে এলেন। কিন্তু তাঁরও মুখ-চোখ থমথমে। কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক লজ্জায় লাল, পা দুটিও যেন কাঁপছিলো। গুটিগুটি তিনি আমার দিকে আসছিলেন, হঠাৎ মার্ডস্টোন গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'উঁহুঁ, অতটা চঞ্চল হলে তো চলবে না! শক্ত হাতে মনের রাশ টেনে ধরতে হবে লক্ষ্মীটি!' সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার দিকে চাইলেন। বললেন, 'এসো ডেভিড! দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। নিঃশব্দে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আমি শুধু আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম, তারপর মার কাছে গিয়ে তাঁকে চুমো খেলাম। তিনিও আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে তাঁর ঠোঁট দুখানা আমার কপালে ছোঁয়ালেন, তারপর দম-দেওয়া পুতুলের মতো এক-পা-দু'পা করে আবার তাঁর সোফাটিতে গিয়ে বসলেন।

এক মুহূর্তও আর সেখানে আমার দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপর একছুটে দোতলায় উঠে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখানে অন্ততঃ নিরিবিলি বসে কিছুক্ষণ কাঁদতে পারবো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়ায়

আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, মা আর পেগটি আমাব খাটের পাশে দাঁড়িয়ে। মায়ের দু'চোখ লাল। মনে হয় অনেক কষ্টে তিনি কান্না চেপে রয়েছেন। আমার বুকের ওপর মাথাটি রেখে তিনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন—'ডেভি, আমার ডেভি, কি হয়েছে তোমার সোনা?'

এতো যে কান্না কেঁদেছি তার চেয়েও অনেক বেশি কান্না যেন এই কথায় আমার চোখ ছাপিয়ে উছলে উঠলো। মা আমায় দু'হাতে একেবারে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরতে চাইছিলেন। কিন্তু না, আমি কিছুতেই যাবো না। দু'হাত শক্ত করে আমি তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছি, হঠাৎ লোমস একটি শক্ত হাত মাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলো। সে হাত মিস্টার মার্ডস্টোনের। দেখি পাথরের মূর্তির মতো ভাবলেশহীন মুখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে। রুক্ষ গলায় মাকে বললেন, 'আবার ছেলেমানুষি করছো? বলিনি, আমি এসব ছিঁচ্‌কাদুনে-পনা পছন্দ করি না! মনকে শক্ত করো ক্লারা। আর যেন কখনো এ সব না দেখি। যাও।'

মা চলে যাচ্ছিলেন, মার্ডস্টোন তাঁর হাত ধরে বুকের কাছে টেনে নিলেন। একটু আদর করে বললেন, 'নীচে যাও লক্ষ্মীটি। ডেভিডকে নিয়ে আমিও একটু পরেই আসছি।'

ঘেন্নায়, বিরক্তিতে আমার মুখ কঠিন হয়ে এলো। মা নেমে যেতেই তিনি দোর বন্ধ করে দিলেন। তারপর বিছানা থেকে টেনে তুলে আমাকে মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার ভারী বিশ্রী লাগছিলো। একটু পরেই মোটা গলায় কর্কশভাবে তিনি আমাকে বললেন, 'ডেভিড, বাড়িতে যদি কোনো দুষ্টু ঘোড়া বা বজ্জাত কুকুর থাকে, আমি তাকে কিভাবে শায়েস্তা করি জানো?'

আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'মেরে। এমন মার তাদের মারি যে, দু'দিনেই

বাপ-বাপ করে তারা আমার বশ হয়ে যায়। বজ্জাত ঢিট করার ওটিই হচ্ছে মোক্ষম দাওয়াই। তার জন্যে ওদের গায়ের সব রক্ত যদি চাবুকের মুখে টেনে আনতে হয় তাতেও আমি পিছপা হই না। যাও এখন মুখ ধুয়ে এসো। আমার সঙ্গে নীচে নামতে হবে।'

একতলায় খাবার ঘরে টেবিলে খাবার সাজিয়ে মা চুপচাপ বসে ছিলেন। মুখ বুজেই তিনজনে খেতে লাগলাম। মার্ডস্টোন অবিশ্যি একথা-সেকথা বলে মাকে একটু খুশি করবার চেষ্টা করছিলেন। মাঝে মাঝে একটু-আধটু আদরও করছিলেন, মাও যে খুশি হয়ে না উঠছিলেন এমন নয়। কিন্তু আমার মুখ আগাগোড়া সেই হাঁড়ি হয়েই রইলো। এই লোকটার ওপর এককোঁটা ভালবাসাও আমার ছিলো না। মা'র খুশি হয়ে ওঠাও আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। রাগে দুঃখে কেমন যেন একটা অভিমান মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিলো।

ওদের কথাবার্তায় বুঝলাম আমার নতুন বাবার এক আইবুড়ো বোন নাকি আমাদের বাড়িতে এসে থাকবেন। আজই রাত্রে নাকি তাঁর আসার কথা। হলোও তাই। সন্ধ্যের আগে আগেই তিনি এসে হাজির হলেন। মার্ডস্টোন লোকটা নিষ্ঠুর এবং গোঁয়ার হলেও মাঝে মাঝে অন্তত: হাসতে জানে। কিন্তু এই মহিলাটি একেবারে রাম-গড়ুরের মত। যেমন রোগা-লিকলিকে তেমনি চোঁয়াড়ে। ওর ঐ চেহারার দিকে চাইলেই বুকের মধ্যে যেন ছ্যাৎ করে ওঠে।

প্রথম এসেই তিনি তার গর্তে ঢোকা কুচুটে চোখ দু'টো আমার দিকে তুলে কটমটিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর খনখনে গলায় মাকে বললেন, 'এই নাকি তোমার ছেলে ?'

মা মাথা নাড়তেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, বাচ্চা-কাচ্চা একদম পছন্দ করি না আমি। তা তোমার নামটি কি বাছা ?'

আমি তখন রাগে ফুলছি। কোনো জবাব দিলাম না। সেদিকে

নজর না দিয়ে তিনি মাকে বললেন, 'তোমার ভাগ্যি ভালো বউ, সংসারের সব ঝুট-ঝামেলা থেকে তোমাকে রেহাই দেবার জন্যে ভাই আমাকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে।' একটু দম নিয়ে বললেন, 'তা যাই হোক, এসে যখন পড়েছি তখন কুটোগাছটিও আর তোমায় নাড়তে হবে না। চাবি-ফাবি কোথায় কি আছে চট্ করে আমার হাতে ফেলে দিয়ে দু'জনে এখন আলগা হয়ে বসো।'

মা কোনো কথা না বলে চুপচাপ উঠে গেলেন।

পরদিন থেকেই মার্ডস্টোন আর তাঁর আমসি-মুখো বোনটিই এ বাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। সংসারের কিছুতেই আর মায়ের কোনো হাত রইলো না। পড়াশোনার হাতে-খড়ি আমার মায়ের কাছেই হয়েছিলো। তাঁর কাছেই পড়তাম। এখন থেকে আর তাও নয়। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বই-খাতা নিয়ে মায়ের কাছে যেতেই মার্ডস্টোন বললেন, 'উহুঁ, ওখানে নয়। আমার কাছে এসে বসো।'

পড়বো কি! ভদ্রলোকের ঐ চেহারা দেখলেই ঘেন্নায় আর বিরক্তিতে পড়াশোনা সবই কেমন যেন গুলিয়ে যেত। সব ভুলে-টুলে আমি যেন গবেট-এর মতো হয়ে যেতাম। কিন্তু ওঁর তো বোঝবার ক্ষমতা ছিলো না। বেত হাতে নিয়েই তিনি বসতেন। দস্তুরমতো চেঁছে-ছুলে যুৎসই গোছের একখানা বেত আমার জন্যে নিজের হাতে তিনি বানিয়েও রেখেছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পড়তে বসে তার সপাসপ শব্দে আর আমার চীৎকারে বহুদিনের সেই শান্ত বাড়িখানা তোলপাড় হয়ে উঠলো। মায়ের সাধ্য ছিলো না কিছু বলেন বা এর কোনো বিহিত করেন। ঘরের এক কোণে বসে সেলাই বুনতে বুনতে চুপচাপ কেবল চোখের জল ফেলতেন। চোখে পড়লেই মার্ডস্টোন আর তার বোন একসঙ্গে খিঁচিয়ে উঠতো আর ভয়ে ভয়ে চোখ মুছে তিনি নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। রাগে গজগজ করতে করতে মার্ডস্টোন বলতেন, 'আদর দিয়েই তো ওর মাথাটি আগে থেকেই খেয়ে

রেখেছো তুমি। মিষ্টি কথায় এসব গাছ-বাঁদরদের কিচ্ছু হবে না বলে রাখছি। মঙ্গল যদি চাও তবে জেনে রেখো লাঠ্যৌষধিই ওর একমাত্র দাওয়াই।'

আর একদিন একলা বসে তাঁর কাছে পড়ছিলাম। মনটা পালাই পালাই করছে। অনেক চেষ্টা করেও যখন তিনি কিছুতেই আমাকে শায়েস্তা করতে পারলেন না,— চড়-চাপড়, কানমলা কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না, তখন হাত ধরে টানতে টানতে তিনি আমায় ওপরে নিয়ে চললেন। মা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই কড়া গলায় তিনি বলে উঠলেন, 'খবরদার ক্লারা, পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো আস্কারা দেওয়া আমি পছন্দ করি না।' চিমসে বোনটিও কাছেই ছিলো। তার দিকে তাকিয়ে মার্ডস্টোন একটুখানি ভুরু কোঁচকালেন; ভাই-বোনে কি যেন একটু ইশারা হলো।

প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

ঘরে ঢুকেই এক পলকে তিনি আমার মাথাটা দুমড়ে-মুচড়ে বগলদাবা করে ফেললেন। তারপর পিঠের জামাটা সরিয়ে সপাসপ্ বেত চালাতে লাগলেন। প্রত্যেকটি আঘাত যেন কেটে কেটে আমার চামড়ায় গিয়ে বসতে লাগলো। যন্ত্রণায় আমি চীৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। শেষে ঐ নিষ্ঠুর নরপিশাচটার হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায় না পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ওর হাতখানা ভীষণ জোরে কামড়ে ধরলাম। 'উঃ' বলে এক চীৎকার করে তিনি হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তাঁর হাতের আঙুল কেটে তখন রক্ত ঝরছে। সেদিকে চোখ পড়তেই তিনি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলেন এবং দিশেহারা হয়ে আরও বেশি করে এলোপাথাড়ি বেত চালাতে লাগলেন। আমার কান্নার রোলে তখন সারা বাড়িটা কেঁপে উঠেছে। শুনতে পেলাম, নীচে মা ও পেগটিও গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

নিষ্ঠুর। কশাইয়ের মত হঠাৎ ছুটে এসে ছেলেদের এলোপাথাড়ি বেত-পেটা করা ছাড়া আর কোনো বিদ্যে নাকি তাঁর জানা নেই। আগে তিনি নাকি ছিলেন ওষুধে-গাছগাছড়ার ব্যাপারী। শেষমেশ দেউলে হয়ে বউয়ের টাকায় অগতির গতি এই ইস্কুল ফেঁদে বসেছেন। এতে লাভও যেমন দু'পয়সা হয়, বাচ্চাদের পিটিয়ে হাতের সুখও হয় কম না। ছোটদের মেরে অদ্ভুত ধরনের একটা আনন্দ পান তিনি। কিন্তু স্টিয়ারফোর্থ-এর গায়ে নাকি কখনো হাত দেন না। সাহসই পান না।

যা হোক, পরদিনে থেকেই পড়াশোনা যথারীতি শুরু হয়ে গেলো। ছেলেরা হই-চই করছিলো কিন্তু গোমড়া মুখো ক্র্যাক্‌ল্‌ সাহেব ঘরে ঢোকামাত্র গোটা ইস্কুল বাড়িটা যেন মড়া-কাটা ঘরের মত নিশ্চুপ হয়ে গেলো। বেশ ভারিক্কি গোছের একখানা বক্তৃতা দিয়ে তিনি শুরু করলেন। বললেন, 'ছেলেরা সব কান দিয়ে আমার কথা শুনে নাও। বছরের এই প্রথম ছ'টি মাসের কথা বলছি। এ সময়টাই হলো আসল। এ সময় পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে সারা বছরটাই ফাঁকিতে পড়বে। আমি তা হতে দেবো না। বেত দিয়ে পিটিয়ে চামড়া কেটে কেটে কি করে মগজের ভেতর বিদ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয় তা আমি জানি। এমন দাগ কেটে দিতে জানি যে জীবনভোর উকো দিয়ে ঘষলেও তা উঠবে না। কাজেই খবরদার, ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না।

বুক-কাঁপানো সেই বক্তৃতা শেষ হলে ভাবলাম, বাঁচা গেল। এবার বোধ হয় তিনি কেটে পড়বেন। কিন্তু না, গুটিগুটি তিনি একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাতের লিকলিকে বেতখানা আমার নাকের ডগায় ছুঁইয়ে বললেন, 'তোমার শুনেছি কামড়ানোর অভ্যেস আছে। এ্যাঁ?'

আমি 'হ্যাঁ-না' কিছু বলবার ফুরসৎই পেলাম না। তার আগেই করে এক ঘা তিনি আমার কানের গোড়ায় বসিয়ে দিলেন।

বললেন, 'আমিও কামড়াই, কিন্তু দাঁত দিয়ে নয়, তার চেয়েও বেশি ধার এই বেত দিয়ে। কেমন মনে হচ্ছে? দাঁতের চেয়ে এর কামড় কি মিষ্টি কম?'

সপাসপ আরো কয়েক ঘা আমার কানে মাথায় এসে পড়লো। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমি স্টিয়ারফোর্থ-এর মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু কেন জানি না, সে এগিয়ে এলো না।

কয়েক ঘা মেরেই ক্র্যাক্‌ল্‌ বললেন, 'নাঃ যুৎ হচ্ছে না'। পিঠের বিজ্ঞাপনটায় বেতখানা হয়ত আটকাচ্ছিল। টান মেরে তক্ষুণি সেটি সরিয়ে নিলেন। বেদম মার খেয়েও সেদিন লাভের মধ্যে আমার ঐটুকুই। একটা লজ্জাকর যন্ত্রণার হাত থেকে পাকাপাকি-ভাবে রেহাই পেয়ে গেলাম।

৪

মাস কয়েক পর ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমিও জিনিসপত্তর বেঁধে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার সেই আগের আনন্দ আর নেই। নেহাৎ যেতে হয় তাই যাচ্ছি। দোরগোড়ায় এসেই বুকখানা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগলো। এই বুঝি চোখে পড়বে আমার বাবা আর তাঁর চিমসে-মুখো বোনটি কোনো জানালার ফাঁক দিয়ে পেঁচার মত আমার দিকে চেয়ে আছে। ভাগ্য ভালো সে রকম কিছু দেখা গেলো না।

দরজা খোলাই ছিলো। চুপিচুপি আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। কানে এলো, মা আমার গুনগুন করে গান গাইছেন। মনে পড়লো, আমি যখন খুব ছোট্ট, আমার কাছে বসে মা এমনি ধারাই মিহি সুরে গান করতেন। কেন জানি না, হঠাৎ আমার দুই

চোখ জলে ভরে উঠলো। ঘরে ঢুকতেই মায়ের চোখাচোখি হলো। আগুনের ধারে বসে তিনি একটি ছোট্ট শিশুকে আদর করছিলেন। আমাকে দেখেই বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তারপর ছুটে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় আমার মুখখানা ভরে দিয়ে বললেন, 'ডেভি, আমার সোনা, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম!'

একটু বাদেই ছুটে এল পেগটি, তার চোখছুটিতে খুশি যেন উপচে পড়ছে। মা আর আমাকে ছুহাতে জড়িয়ে থপথপিয়ে সে নাচতে শুরু করলো। ভাগ্যিস বাবা আর পিসী ছুজনের একজনও সেদিন বাড়ি ছিলেন না। বাইরে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরবেন অনেক রাতে। অনেকদিন পরে ঠিক আগের মতই আবার আমরা তিনজন মিলেমিশে তাই আনন্দ করতে পারলাম।

মা, আমি আর পেগটি এক সঙ্গে খেতে বসলাম। মনের খুশিতে ইনিয়ে বিনিয়ে মাকে আমার ইস্কুলের গল্প শোনাতে লাগলাম। বদরাগী হেডমাস্টারটার কথা শুনে মা যেন ছুঃখে, ভাবনায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেলেন। স্টিয়ারফোর্থ-এর কথা শুনে যদিও তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন তবু তাঁর মনের মেঘ যেন সম্পূর্ণ কাটলো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দোলনা থেকে তুলে বাচ্চা নতুন ভাইটিকে বুকে নিলাম। চোখ পিট পিট করে আমার কোলের মধ্যেই সে জেগে উঠলো। নরম তুলতুলে গালছুটিতে চুমো দিয়ে দিয়ে আমি তাকে আদর করতে লাগলাম। খুটখুটিয়ে তার কি হাসি! আমার একদিকে মা আর একদিকে পেগটি। আঃ কতদিন পরে আবার এই সুখ। এই মনখোলা আবহাওয়া! সেই সুন্দর সন্ধ্যাটি আজীবন আমার মনে এক আশ্চর্য সুখ-স্মৃতি হয়ে থাকবে।

সুখ অবশ্য বেশিক্ষণ রইলো না। রাত দশটা বাজতেই বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ঝট করে মা আমার হাত ধরে দোতলায়

নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বললেন, 'চোখ বুজে থাকো লক্ষ্মীটি। তোমার বাবা যদি দেখেন এত রাত অবধি আমরা গল্প করছি, তবে আর রক্ষা থাকবে না।'

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনটা বিশ্রী হয়ে গেল। এক্ষুণি নীচে নেমেই আবার ঐ নতুন বাপ আর উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা পিসীর পাল্লায় পড়তে হবে। কাল সন্ধ্যের মত মাকে আর নিজের মত করে পাবো না। পদে পদে শাসন আর হুকুমের নাগপাশে তিনি যেন কেমন জবুথবু হয়ে থাকবেন। মা হলেও তিনি যে কেউ নন, এই ভাবে তাঁর পাশে বসে ঐ তুটোর সঙ্গে এক টেবিলে মুখ বুজে চা খেতে হবে।

নীচে নামলে বাবা আমাকে যেন দেখেও দেখতে পেলেন না। এক পা তু'পা করে আমি তাঁর সামনে গেলাম। বললাম, 'ইস্কুল ছুটি হয়েছে, কাল সন্ধ্যায় বাড়ি এসেছি।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললাম, 'সেদিন ব্যথার জ্বালায় আপনার আঙুল কামড়ে দিয়েছিলাম, তার জন্য সত্যিই আমি লজ্জিত। আমায় ক্ষমা করুন।'

—'তাও ভালো যে লজ্জা পেয়েছো, ক্ষমা চাইছো'—বলে আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি সেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। আমি সেটি ধরে ঝাকুনি দেওয়ার আগেই খনখনে গলায় পিসী বললেন, 'ছুটি ক'দিন ?'

আমি বললাম, 'আজ থেকে এক মাস।' সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারে লাল পেন্সিল দিয়ে সেদিনের তারিখটি তিনি কেটে দিলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে তার একটি দিন আজ কেটে গেল তাই না ?'

ফ্যালফ্যাল করে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। দেখলাম শুধু আমি নই, মাও ঠিক সেই ভাবেই তাকিয়ে আছেন।

পিসীর কেবল এক চিন্তা, কবে আমার ছুটি ফুরোবে, কবে আমি এ বাড়ি থেকে বিদায় হবো। লাল পেন্সিল দিয়ে দিনের পর দিন

তিনি ক্যালেণ্ডারের তারিখ কাটতে লাগলেন আর আমিও মুখ বুজে সেই হেলা-ফেলা সহ্য করতে লাগলাম।

ছুটি একদিন সত্যি সত্যিই ফুরোলো। আবার সেই একঘেয়ে ইস্কুল জীবনের বিভীষিকা। সেই প্রাণহীন সালেম-হাউসের বীভৎস ছবি আর ক্র্যাক্‌ল্ সাহেবের ভয়ঙ্কর মুখ। গাড়িতে ওঠার সময় ভয়ে ভয়ে মা আমার কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন। কি করুণ দেখাচ্ছিল তাঁর মুখখানি! আদরে জড়িয়ে ধরে তিনি আমাকে চুমো খেতে যাচ্ছিলেন, এবারও সেই পিসীর গলার গম্ভীর 'উঁহু', আর হঠাৎ চমকে উঠে মায়ের সেই মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাওয়া। যতদূর দেখা যায় চলন্ত গাড়ি থেকে আমার সেই বাড়ির দিকে চেয়ে থাকা। তারপর বুকভাঙা নিঃশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া।

আবার সেই ইস্কুলের দুঃসহ জীবনযাত্রা। শেষ রাতে মন-মরা মোমের আলোয়, হাত পা কালিয়ে নেওয়া ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা ছেড়ে ওঠা, মুখ ধোয়া, পোশাক বদলানো, তারপর বরফ-ঠাণ্ডা বেঞ্চের ওপর বসে একঘেয়ে ক্লাশ করা আর কথায় কথায় বেতের ঘায়ে পিঠের ছাল-ওঠা জ্বলুনি। ভাবলে এখনো যেন বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়।

এমনি করেই মার্চ মাস এসে গেলো। এ মাসে আমার জন্মদিন। এত দুঃখের মধ্যেও মনটা খুশি হয়ে উঠলো। অন্ততঃ দু' একদিনের জন্যও বাড়ি যেতে পারবো। সেখান থেকে চিঠির আশায় মশগুল হয়ে আছি, হঠাৎ ক্র্যাক্‌ল্ সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়লো। খুশি মনেই আমি তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। নিশ্চয়ই বাড়ি যাবার খবর। ঘরের ভেতর ক্র্যাক্‌ল্ সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। মুখ দুজনেরই গম্ভীর। সামনে টেবিলের ওপর একখানা খোলা চিঠি। তিনি বললেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

কিছু বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি আবার বললেন, 'কপারফিল্ড, খুবই দুঃখের সঙ্গে তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার মা ভীষণ অসুস্থ। এক্ষুণি তোমার বাড়ি চলে যাওয়া দরকার।'

তাঁর কথার মধ্যে কি যেন একটা অশুভ সংকেত ছিলো! শোনা মাত্রই আমার বুকের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো। দুচোখ জলে ভরে অদ্ভুত একটা কান্না যেন গলার ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগলো।

মিসেস্ ক্র্যাক্‌ল্ বললেন, 'এখন কান্নার সময় নয় কপারফিল্ড। গাড়ি তৈরি। এক্ষুণি তোমাকে রওনা হতে হবে। তোমার মায়ের অসুখ খুবই সাংঘাতিক—' তাঁর পরের কথাগুলো কিছুই আর কানে ঢুকছিলো না। মন কেবলি বলছিল মা আর বেঁচে নেই। জন্মের মত তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। পাগলের মত দুহাত তুলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'হা ঈশ্বর!' মিসেস্ ক্র্যাক্‌ল্ আমায় সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

পরদিন সকাল ন'টায় কান্না-ফোলা দুটি রাঙা চোখে বাড়ির গোড়ায় নামতেই আমার কাছে সব কিছু জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেল। গোটা বাড়িটা থমথমে! মৃত্যুর মত নিশ্চুপ। আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য কেউ ছুটে এলো না। অনেকক্ষণ বাদে চাকরটা এসে নিঃশব্দে আমার মালপত্রগুলি নামাতে লাগলো। তার মুখ দেখেই বুঝলাম, যা ভেবেছি তাই, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না, তবু কোনমতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাচ্চাটা কেমন আছে? আমার ভাগ্যহীন ছোট ভাইটা?'

তেমনি মাথা নীচু করেই কাঁধে-কপালে হাত ছুঁইয়ে সে ক্রুশ আঁকলো, তারপর বিড়বিড় করে বললো, 'সেও তার মা'র সঙ্গেই চলে গিয়েছে স্যার।'

আমার মাথাটা ভীষণভাবে ঘুরে উঠলো। চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে আমি সেই দোরগোড়ায় বসে পড়লাম।

৫

মা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পিসী পেগটিকে ছাড়িয়ে দিলেন। এতদিনের পুরোনো ঝি, এ বাড়ি তার প্রায় নিজের বাড়ি হয়ে উঠছিলো। সে কাঁদতে লাগলো। এ বাড়ি ছাড়লে এখানে আর কোথাও সে থাকবে না। সোজা ইয়ার মাউথে, ভাইয়ের বাড়িতেই চলে যাবে। আমি অনেক করে বোঝালাম কাছাকাছিই কোথাও কাজ নিতে কিন্তু পিসীর ব্যবহারে তার মন ভেঙে গিয়েছিল। সে রাজী হলো না। মা নেই, এমনিতেই বাড়িখানা শ্মশান হয়ে গিয়েছে, তার ওপর পেগটিও যদি চলে যায়, থাকবো কাকে নিয়ে?

তবে পেগটি বললো, 'তুমিও আমার সঙ্গে চলো দাদাবাবু।' কিন্তু বাবা বা পিসীমা হুকুম না দিলে তো আর যাওয়া হয় না! তাদের সামনে একথা তুলবেই বা কে? পেগটির এত সাহস আগে দেখিনি। স্বচ্ছন্দে সে গিয়ে পিসীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে আনলো। আপদ গেল ভেবে বোধ হয় খুশি মনেই তিনি হুকুম দিলেন।

অনেকদিন পর আবার সেই নৌকো-নিবাস। পেগটির ভাই আর হ্যাম বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের পেছনে গুটিসুটি মিসেস গামিজও। কিন্তু এমিলি? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

পেগটি বললো, 'ইস্কুলে গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে।'

একটু পরেই দেখতে পেলাম সে আসছে। আগের চেয়ে এখন অনেকটা ডাগর হয়েছে। চলার ভঙ্গিটি কিন্তু বদলায়নি। একবার

মনে হলো ও আমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই এক ছুটে ওর সামনে গিয়ে ওকে অবাক করে দিই, আবার ভাবলাম না, থাক। একেবারে কাছে এসে পড়তেই কিন্তু একটু দুষ্টুমি না করে পারলাম না। ওকে যেন দেখতেই পাইনি এমন ধারা ভাবখানা করে আমি অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। সেও কিন্তু ঠিকই আমাকে নজর করছিলো কিন্তু তক্ষুণি সামনে না এসে মুখে সামান্য একটু চাপা হাসির ঝিলিক খেলিয়ে সোজা ঘরমুখো দৌড় দিলো। হেরে গিয়ে অগত্যা আমাকেই ওর পেছনে ছুটতে হলো। দোরের কাছাকাছি এসে ওকে ধরে ফেললাম। বললাম, 'আরে কে এটি! নীল পুঁতির হার পরা আমাদের সেই ঝিনুক কুড়োনো ছোট্ট পরীটি না?'

কথায় সেও কম যায় না। বললো, 'তবু ভাগ্যিস চিনতে পারলে। না চেনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে যে বড়?'

হেসে আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মনে হলো না, না, ঠিক হবে না। ও তো এখন আর ছোট্ট খুকিটি নয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ডাগর চোখ দুটিতে এখন আর শুধু বুদ্ধি আর দুষ্টুমির চঞ্চলতাই নয়, তার সাথে লজ্জার একটি মিহি-মিহি লালচে আভাও এসে মিশেছে। তাইতেই আগের চেয়ে যেন আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বসে আরম্ভ হলো গল্প। সুখ-দুঃখের অনেক কথা জমে ছিলো মনে। সালেম-হাউসের কথা, বন্ধু স্টিয়ার-ফোর্থের কথা, মারকুটে ক্র্যাকল্ সাহেবের কথা। একমনে সে শুনছিলো। কখনো দুঃখে, কখনো কৌতূহলে, কখনো সমবেদনায় ওর কোমল মুখখানি অপরূপ হয়ে উঠছিলো। কিন্তু এ দিন ক'টিও একদিন ফুরিয়ে এলো। পেগটি ও এমিলিকে ফেলে শূন্য মনে আমার ঘরে ফিরতে হলো। বাড়ির সামনেই রাস্তার ওপর আমাকে নতুন বাবা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি পাশ কাটিয়ে

বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে সেই ভদ্রলোক আমায় ডাকলেন, 'আরে! ডেভি জোন্‌স্ যে। কি খবর?' 'জোন্‌স্' আমার নতুন বাবার পদবী। আমার তা ভারী অপছন্দ।

আমি বললাম, 'ডেভি জোন্‌স্ নয়। আমার নাম ডেভিড কপারফিল্ড।'

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তুমি বললেই তো হবে না। আইনতঃ তুমি ডেভি জোন্‌স্‌ই।' হাসির শব্দেই ভদ্রলোককে হঠাৎ আমি চিনে ফেললাম। সেই লোস্টফ্‌ট্-এর হোটেলে যাকে দেখে-ছিলাম তিনি না? কি একটা কথা শেষ করার আগেই বাবা তাঁকে চোখ টিপে থামিয়ে দিয়েছিলেন? সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে উঠলো।

ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত রাখলেন। পড়াশোনায় কতদূর এগিয়েছি জানতে চাইলেন। বাবা নাক কুঁচকে বললেন, 'পড়াশোনা! লবডঙ্কা হবে ওর। এমন বেয়াড়া ছেলের ওসব হয় নাকি কখনো?' তারপরই আমার দিকে ফিরলেন তিনিঃ 'শোনো ডেভিড, যা বলবার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। দুনিয়াটা হলো কাজের জায়গা। আলসেদের এখানে স্থান নেই। তাদের উপর আমার কোনো মায়াও নেই। আমার ঘাড়ে বসে বিনি খরচায় তোমার খাওয়া-পরা আর চলবে না। চলা উচিতও নয়। লেখাপড়ায়ও কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকার দরকার। সে ক্ষমতা আমার নেই, আর থাকলেও তোমার মত বখা ছেলের জন্য আমি তা খরচ করতেও রাজী নই। আজ থেকেই তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে। বুঝলে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'মার্ডস্টোন অ্যাণ্ড গ্রিনবী কোম্পানির নাম শুনেছো নিশ্চয়ই। লণ্ডনে মদের ব্যবসা আছে তাদের। এই ভদ্রলোক সেই কোম্পানির ম্যানেজার। কাল ভোরেই

ইনি লণ্ডনে যাচ্ছেন। তোমাকেও এঁর সঙ্গে যেতে হবে। ইনি তোমাকে সেই কোম্পানিতে যা-হোক কিছুতে ঢুকিয়ে দেবেন। কেমন মিস্টার কুইনিয়ন, ঠিক তো ?'

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়লেন। আমার মনে হলো পায়ের তলা থেকে এতদিনে সত্যিই মাটি সরে যাচ্ছে।

৬

দশ বছর বয়সেই অগত্যা গ্রিনবী কোম্পানির মদের কারখানায় ঢুকতে হলো। ভালো কোনো চাকরিতে নয়। মজুর হয়ে। কারখানাটি লণ্ডনের এক বস্তিপাড়ায়। টেম্‌স-এর ধারেই। যেমন পাড়ার ছিরি, তেমনি চেহারা এই কারখানার। মাল ওঠানো-নামানোর জন্য নদীর ওপর নড়বড়ে একটি কাঠের জেটি, তারই লাগোয়া গুদামঘর আর আপিস। জোয়ারের সময় জল আর ভাঁটার সময় কাদা। এরই ওপর আপিসখানাকে বারোমাস দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঘর দু'খানাও যেমন এঁদো, তেমনি ঘুপসি আর ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুরে ভর্তি।

আমার কাজ হলো মদ ভরবার জন্য গাদাগাদা খালি বোতল টুটা-ফুটা বেছে, ধুয়ে-মুছে সাফ করে সাজিয়ে রাখা, তারপর মদ ভরার পর সেগুলিকে ছিপি পরিয়ে কোম্পানির লেবেল সেঁটে পিপের ভেতর গুছিয়ে রাখা। মজুরি হপ্তায় ছ'শিলিং। যে-সব ছোকরাদের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হতো তারাও সব বস্তির ছেলে। লেখা-পড়ার ধারে-কাছে দিয়েও নেই। কারো বাপ জেলে, কারো মাঝি, কারো গাড়োয়ান বা দিনমজুর। এরকম সংসর্গে আমি মানুষ হইনি। দুঃখে অভিমানে মন একেবারে ভেঙে পড়লো। কত আশা ছিলো

পড়াশোনা করে মানুষ হয়ে দেশের-দশের একজন হবো। কিন্তু এই বয়সেই আশার সব আলো নিভে গেলো। জীবনটা অন্ধকার হয়ে গেলো।

একদিন দুপুরবেলা কুইনিয়ন সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি আঁটো-সাঁটো পোশাকে, টাক-মাথা, মোটাসোটা গোছের মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোক তাঁর ঘরে বসে আছেন। কুইনিয়ন পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এঁর নাম মিস্টার মিকাবর। মাঝে মাঝে আমাদের কোম্পানির হয়ে কাজকর্ম করেন। তোমার বাবার সঙ্গেও এঁর পরিচয় আছে। এঁরই বাড়ির দোতলায় একটি ঘর খালি আছে। সেখানে তুমি ভাড়া থাকবে। কেমন ?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

সন্ধ্যের আগেই সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মিস্টার মিকাবর আমাকে তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক নিজে যেমন মোটা-সোটা, বউটি তার উল্টো। যেমন রোগা, তেমনি ঢ্যাঙা। বয়সেও মিকাবরের দিদির মতন। একটি কোলের বাচ্চাকে বুকে নিয়ে তিনি বসেছিলেন। আমায় দেখে বললেন, 'এসো বাবা।' একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'জীবনে কখনো ভাবিনি বাবা, যে বাড়িতে ভাড়াটে বসাতে হবে। আমার স্বামীর যে দুঃসময় চলেছে, তাতে আর লজ্জার বালাই রাখা গেল না।' ভদ্রমহিলা প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলেন : 'হাতে একটি পয়সাও নেই। চারদিক্ থেকে পাওনাদাররা ছেঁকে ধরেছে। জেলের ভয় দেখাচ্ছে। কি করে যে তিনি উদ্ধার পাবেন জানি না। গয়নাপত্র যা ছিলো সবই বাঁধা পড়েছে। এখন কি করে চলবে ঈশ্বরই জানেন।'

ভারী কষ্ট হচ্ছিলো ওঁর সরল কথাগুলি শুনে। কিন্তু কি আর বলবো ? মহিলাটি বলে চললেন, 'ভেবো না বদখেয়ালে উনি টাকা নষ্ট করেছেন। মানুষটি খুবই খাঁটি। আসলে কপালখানাই

মন্দ। চেষ্টা কম করেননি কিন্তু যাতে হাত দিয়েছেন তাতেই লোকসান খেয়েছেন।'

মিকাবর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় যত বেশি হয়েছে ততই বুঝেছি কথাটা সত্যি। দেখেছি এত কষ্টের মধ্যেও একেবারে ভেঙে পড়েন নি তিনি। এক এক সময় দেনার দায়ে পাগল হয়ে উঠেছেন। আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছেন কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের জোরে সেই ভাব কাটিয়ে উঠে আবার উঠে-পড়ে লেগেছেন নতুন কিছু করার জন্য। ছেঁড়া, ময়লা জুতো নিজ হাতে পালিশ করে যথাসম্ভব ফিটফাট হয়ে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়েছেন দ্বিগুণ উৎসাহে, দিব্যি গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। কখনো ছেলেমানুষের মত হতাশায় ভেঙে পড়েছেন একদম। একটু পরেই দেখেছি কুড়িয়ে-কাড়িয়ে ঘরের দু'একটি পুরোনো রূপোর চামচ বাঁধা দিয়ে বউ-ছেলের জন্য খাবার-দাবার এনে মনের আনন্দে টেবিল সাজাচ্ছেন। এক একদিন শুনেছি কালই তাঁকে জেলে যেতে হবে, আর বিকেলেই দেখেছি বউকে বলছেন, 'জেল থেকে ফিরে এসেই আমার ঘরের ছোট্ট জানালাটি ভেঙে আরো বড়সড় ও আধখানা চাঁদের মত বাহারী ডিজাইন-এ তৈরি করিয়ে নেব।' শুনে অত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পেতো।

আমার নিজের অভাবও বড় কম ছিলো না। ছয় শিলিং রুজিতে সাত-সাতটি দিন ম্যাজিক না জানলে চালানো অসম্ভব। ঘরভাড়া সামান্যই, তবু সেটুকু দেবার পর এমন সম্বলটুকু আমার থাকতো না যাতে দুবেলা দুখানা শুকনো রুটি আর একটু পনীরও জোগাড় করা যায়। অনেক সপ্তাহ আমাকে একবেলা খেয়েও থাকতে হতো। তবু নিজের চেয়েও ওঁদের কষ্টটাই বেশি করে আমার বুকে বাজতো।

একদিন সত্যি সত্যি মিকাবরকে জেলে যেতে হলো। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে দেউলে প্রমাণ করে তিনি ছাড়া পেয়ে গেলেন। এ ছাড়া অন্য উপায় তাঁর ছিলো না। এখন তিনি কি

করবেন এই হলো কথা। শুনলাম ওঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চেষ্টাচরিত্র করছেন সরকারী শুল্ক বিভাগে ওঁর জন্য একটা কাজ যোগাড় করে দিতে। কিন্তু এখানে নয়, প্লিমাথ-এ। সেখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছু আছে।

আমি মিসেস্ মিকাবরকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কি সংসার এখানে ফেলে অতদূর যাবেন?

মিসেস্ বললেন নিশ্চয়ই যাবেন এবং একলা নয়, আমাদের নিয়েই। গলা একটু খাটো করলেন ভদ্রমহিলা: 'এখন আর তুমি শুধু আমাদের ভাড়াটে নও বাবা। এ সংসারেরই একজন। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, ওঁকে একলা ছেড়ে দিয়ে কোথাও আমি থাকতে পারি না। গয়নাগাটি যা গেছে যাক্, একটুও দুঃখু নেই আমার, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলে একদিন তার অনেক বেশিই হয়ত ফিরে পাবো, কিন্তু এই চরম দুঃখের দিনে ওঁকে ফেলে স্বর্গে গিয়েও আমি শান্তি পাবো না।'

কথাগুলো শুনে ভারী লজ্জা পেলাম। তিনি কি ভেবেছেন তাঁকে আমি এখানে থাকতে বলছি? তাড়াতাড়ি আমি বলে উঠলাম, 'না, না, আমি তা বলিনি। আপনাকেও ওঁর সঙ্গেই যেতে হবে বই কি!'

চলে যাবার আগের দিন মিকাবর সাহেব আমাকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'চললাম কপারফিল্ড। তোমাকে ছেড়ে যেতে হলো। এইটেই আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট। তুমি আমার অনেক দুঃখের দিনের সাথী। তোমার মায়া-মমতার কথা কোনদিনই আমরা ভুলতে পারবো না।'

আমি থমথমে মুখে চুপ করে বসে রইলাম। তিনি বললেন, 'তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই। শুধু বাপের বয়সী হিসেবে দুটি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, মনে রেখো। ভবিষ্যৎ জীবনে তোমার কাজে লাগবে।'

আমি বললাম, 'বলুন। নিশ্চয়ই মনে রাখবো।'

তিনি বললেন, 'অবশ্যি যা বলব, নিজের জীবনে আমি তা মেনে চলিনি। তাই আজ আমার এই অবস্থা। তুমিও যাতে আমার মতন না ঠকো, তাই আমার এক নম্বর উপদেশ হচ্ছে, আজ যে কাজ করতে পারবে তা কালকের জন্য কক্ষণো ফেলে রাখবে না, আর দু'নম্বর হচ্ছে যতটুকুনই আয় করো না কেন, তার সকটুকুই ব্যয় করে ফেলবে না। কিছু অন্ততঃ সঞ্চয় করবে।'

আমি মাথা নীচু করে, বললাম, 'ধন্যবাদ। আপনার কথা আজীবন আমি মনে রাখবো।'

৭

আবার আমি যে একা, সেই একা। মনে হতে লাগলো দুনিয়ায় আর যেন আমার কেউ নেই। চাকরিটা না করলে নয়, তাই কোনো গতিকে যাই-আসি। মন বসাতে পারি না কিছুতেই। শেষমেশ ঠিক করলাম, নাঃ, ছেড়েই দেবো। এখানে এভাবে জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু কোথায় যাবো? হঠাৎ মনে পড়লো, মা'র কাছে শুনেছিলাম, ডোভারের কাছে কোথায় যেন আমার নিজের বাবার এক আপন পিসী আছেন। জীবনে তাঁকে কখনো দেখিনি। বেঁচে আছেন কিনা তাও সঠিক জানি না। আমার মাকে বিয়ে করার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে তাঁর কিছুটা মনান্তর হয়েছিলো। সেই থেকে তিনি আর আমাদের বাড়িতে আসেন নি। কিন্তু হাজার হলেও পৃথিবীতে এখন তিনিই আমার একমাত্র আপন জন। তাঁকেই আমার খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু ঠিকানা? মাথায় এলো, পেগটিকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত কোনো হদিশ মিলতে পারে।

পরদিনই তাকে চিঠি লিখে দিলাম। পেগটি জানালো, বুড়ী ডোভারে থাকেন, কিন্তু পুরো ঠিকানা সে জানে না। শুধু চিঠির জবাব দিয়েই সে ক্ষ্যান্ত হয়নি। পথে আমার পয়সা-কড়ি কিছু দরকার হতে পারে মনে করে আমাকে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এই স্নেহের জন্য মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে এক শনিবারের সকালে কাজে ইস্তফা দিয়ে সত্যি সত্যি আমি ডোভারের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

লণ্ডন ছাড়িয়ে ডোভার রোড ধরে চলেছি। রাস্তাটি সালেম-হাউসের গা ঘেঁষেই গিয়েছে। সেখানে এসে রাত হয়ে গেলো। স্কুলের পেছনে মাঠের কোণে একটা খড়ের গাদা। তারই তলায় আশ্রয় নিলাম। সারারাত সেখানে শুয়েই কাটলো। ভারী অদ্ভুত লাগ ছিলো যখন মনে হচ্ছিলো, ঐ তো ওখানে কয়েক গজ দূরেই স্কুলের হাতার মধ্যে আমার চেনা-শোনা সহপাঠি বন্ধুরা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে আর আমি এখানে, এত কাছে, একা একা খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছি—ওরা জানতেও পারছে না। সারারাত ঘুম এলো না।

ভোর হবার আগেই, পাছে কেউ দেখে ফেলে ভেবে, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লাম। রাস্তাটা এবার গেঁয়ো। ধুলোয় ধুলাকার। সন্ধ্যেয়, একটানা হেঁটে প্রায় তেইশ মাইল পেরিয়ে এলাম। সে রাতটাও গাছ-গাছালির নীচে শুয়েই কাটলো। পরদিন আরো বিশ মাইল পাড়ি দিয়ে ক্যাণ্টারবেরীতে এলাম। এত মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গলের পর এই সুন্দর পুরানো শহরটিতে এসে ভারী ভাল লাগলো। ক্যাণ্টারবেরী তো আর আজকের শহর নয়! কত নাম শুনেছি এর রূপের, অলিগলি-প্যাঁচানো সাবেকি পথ-ঘাটের আর বিখ্যাত প্রাচীন গির্জাটির সামনেই দেখতে পাচ্ছি সেটিকে তার ধূসর রঙের চূড়া শহরের সমস্ত দালান-কোঠা ছাড়িয়ে আকাশের অনেক

উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। উজ্জ্বল রোদে সারা শহরটি যেন ছবির মতো ঝক্‌ঝক করছে!

কিন্তু শরীরের অবস্থা ঠিক ছবি দেখার মতো নয়। পায়ে বড় বড় ফোস্কা, মাথাময় ধুলোর পলেস্তারা, গায়ে-গতরে দুরমুশ-টাটানি। একটু জিরোতে পারলে ভালো হতো কিন্তু উপায় নেই। একটা সরাইখানায় সামান্য কিছু মুখে দিয়েই আবার হাঁটতে শুরু করলাম। পাঁচ দিনের দিন ডোভারের সেই চুনাপাথরের পাহাড় দূর থেকে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দুপুর নাগাদ আমি ডোভার শহরে পা দিলাম।

কাছেই সমুদ্রের পারে বাঁধা এক গাদা জেলে নৌকো। ভাবলাম, মাঝিরা হয়ত দিদিমাকে চিনবে। কিন্তু না, কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারলো না। মনটা দমে গেলো। খিদেয়, পিপাসায় আমি তখন ধুঁকছি। আর এক পা চলি, এমন সাধ্য নেই। ডাইনে বাজারের মুখে একটা দোকান। ধপ্ করে তার রকের উপর বসে পড়লাম। একখানা ছ্যাকড়া গাড়ি এ দিকে আসছিলো। গাড়োয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে মিস্ বেটসি ট্রটউড বলে ধারে-কাছে কেউ থাকেন কিনা।

গাড়োয়ান বিড়বিড় করে নামটা বার দুই আউড়ে নিলো। তারপর বললো, 'মহিলাটির মাথার চুলগুলো ধবধবে শাদা, না?'

আমি ঘাড় নাড়তেই সে তার হাতের চাবুকটি সামনের দিকে তাক করে বললো, 'ঐ যে, রাস্তাটা উঁচুতে উঠে বাঁক নিয়েছে, ওখানটায় গিয়ে ডাইনে চোখ ফেরালেই দেখবে সমুদ্রের মুখোমুখি কয়েকখানা বাড়ি। তাদের মধ্যে যেটি মাঝামাঝি সেটিই তাঁর।'

ওর কথামতো জায়গাটিতে এসে দাঁড়ালাম। সমুদ্র এখান থেকে আরো সুন্দর। পথের বাঁকেই একটি মুদীখানা। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ফিটফাট, সুশ্রী মেয়ে সেখানে সওদা কিনছিলো। আমি

দোকানীকে মিস বেটসির কথা জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি আমার দিকে চোখ ফেরালো। বললো, 'মিস্ ট্রটউড-এর বাড়ি খুঁজছো? আমি তাঁরই ঝি। এসো আমার সঙ্গে।'

যাক্, ঠাকুরমাকে তা হলে সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল! আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!

মেয়েটি আমায় নিয়ে ছিমছাম একটি ছোট বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়িটির বাইরে ঘাসে ঢাকা একটি খাসা লন। রঙ-বেরঙের নানা ফুলগাছে ভর্তি। মাঝখান দিয়ে সুন্দর একফালি পথ বাড়ির দোরগোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। মেয়েটি আমাকে গেট-এ দাঁড় করিয়ে ভেতরে চলে গেলো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ডালপালা ছাঁটবার মস্ত একখানা কাঁচি হাতে নিয়ে, গাউনের ওপর গাঢ় সবুজে রঙের একখানা অ্যাপ্রন ঝুলিয়ে একটি বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। চুলগুলি সত্যি কাশফুলের মত শাদা। কিন্তু বয়েস আন্দাজে বেশ শক্ত-সমর্থই আছেন। দিব্যি বুকটান করে বেশ কিছুটা ডোণ্ট-কেয়ার ভাব নিয়েই যেন হাঁটছেন। ইনিই নির্ঘাত আমার ঠাকুরমা। মায়ের কাছে তাঁর হাঁটাচলার এই বিশেষ ভঙ্গীটির কথা অনেক শুনেছি।

কাছে এসেই আমার নাকের গোড়ায় আঙুল তুলে তিনি বললেন, 'গেটটা ছেড়ে দাঁড়াও। রাজ্যের ভবঘুরে ছোকরাদের পিঁজরাপোল নয় এটা। সরে পড়ো।'

বুকের ভেতর দুরদুর করছিলো। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। এগিয়ে এসে একেবারে তাঁর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। হাতখানা ধরে বললাম, 'আমি ভবঘুরে নই ঠাকু'মা। তোমার নাতি।'

—'নাতি!'

—'হ্যাঁ, আমি হলাম গিয়ে ডেভিড কপারফিল্ড। সাফোক্-এর ব্লাণ্ডারস্টোন-এ আমার বাড়ি।'

মুখের কাছে চোখ দুটি এনে বুড়ী অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হা ভগবান! ডেভি! কিন্তু কি করে আমি তোকে চিনবো বল্! জন্মের পর মায়ের কোলে এতটুকুন একটু ন্যাকড়ার দলার মতন সেই একবার মাত্র দেখেছি, সেও প্রায় এক যুগের কথা।' বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে আমার হাত ধরে তিনি আমায় তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। হাত বাড়িয়ে বেল টিপলেন। হন্তদন্ত হয়ে সেই মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকলো।

ঠাকু'মা বললেন, 'জেনেট, এক্ষুণি চানের জল গরম করে আনো।'

একটু অবাকই হলো জেনেট। কিন্তু কথাটি না বলে সে বেরিয়ে গেল। ঠাকু'মা হাত দুখানা পেছনে নিয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে লাগলেন। জেনেট আর ঠাকু'মার মতো ঘরখানিও দিব্যি ফিটফাট। আসবাবপত্র সেই সাবেকি আমলের কিন্তু এত ঝকমকে-তকতকে যে মুখ দেখা যায়। মোটাসোটা, গোলগাল একটি পুশী বেড়ালও আছে। ঠাকু'মার পায়ের কাছে সেটি ঘুর ঘুর করছিলো। এক কোণে দাঁড়ের উপর সুন্দর একজোড়া ক্যানারী পাখি দানা খুঁটছে, টিপয়ের উপর ফুলদানীতে একগোছা সদ্য তুলে আনা গোলাপ, পাশেই চীনে মাটির একটি বাটিভরা একরাশ শুকনো গোলাপ-পাপড়ি, দোরের ধারে কাচের আলমারিতে ছোটবড় নানা রকমের বোতল আর কাচের বাটি পরিপাটি ভাবে সাজানো।

পাশের বাড়িতে নিশ্চয়ই আমার বয়সী একটি ছেলে ছিলো। সেখান থেকে, ধোয়া একপ্রস্থ পোশাক আমার জন্য ধার করে আনলেন ঠাকু'মা। স্নানের পর তাই পরে আমি ফিটফাট হয়ে বসলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর সঙ্গে গল্প শুরু হলো। নতুন বাবা, নতুন পিসী, সালেম-হাউস, মায়ের মৃত্যু, গ্রিনবী কোম্পানির চাকরি, মিকাবর সাহেব, তার বউ, সব শেষে এখানে পালিয়ে আসা, এক এক করে সবই তাঁকে বললাম। বলতে বলতে আমার দুচোখ

দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। ঠাকু'মার চোখও শুকনো ছিলো না। এক সময় নিঃশব্দে তিনি আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, অনেকক্ষণ পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, এখন শুবি চল্।'

সে রাতে ঠাকুরমার কাছেই শুলাম। অনেক দিন পরে মনে হলো আবার যেন মায়ের বুকে শুয়েছি। আর কি সুন্দর বিছানা! সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সারারাত স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিলো। ঠাকু'মা আমার সারা গায়ে হাত বুলোচ্ছেন আর মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরছেন আর বলছেন, 'আহা আমার ডেভিড-এর ছেলে, তার স্মৃতি, আহা চিরদুঃখী বেচারা……আমার সোনা…'

পরদিন ঠাকু'মা আমার নতুন বাবাকে চিঠি লিখলেন, তাঁর বোনকে নিয়ে তিনি যেন পত্রপাঠ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। যদিও মন তা বলছিলো না, তবু ভাবনা হচ্ছিলো ঠাকুরমা কি আবার আমাকে তাঁদের হাতেই তুলে দেবেন? কথাটা মুখ খুলে একসময় তাঁকে বলেও ফেললাম।

তিনি শুধু শুনে গেলেন। মুখ ফুটে কিছু ভাঙলেন না। কেবল বললেন, 'দেখা যাক্। এখনো কিছু ঠিক করিনি।'

আমি ককিয়ে উঠলাম, 'না, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি ঠাকু'মা! ওদের খপ্পরে আর আমায় ফেলে দিও না। তার চেয়ে আমার মরে যাওয়াও ভাল।'

চাপা গলায় ঠাকু'মা বললেন, 'বালাই ষাট! ও কথা বলতে নেই, দেখি কি করা যায়।'

ভয় কিন্তু আমার দূর হলো না। দুরুদুরু মনে ওদের আসার দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েকদিন পরে জবাব এলো তাঁরা আসছেন। পরের রবিবারেই দুটি ঘোড়ার পিঠে তাদের যুগল-মূর্তি আমাদের দোরগোড়ায় এসে উদয় হলো। সঙ্গে সঙ্গেই একছুটে

আমি বাড়ির ভেতর গিয়ে লুকোলাম। কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুমা'কে বললাম, 'ওঁরা এসে পড়েছেন। এবার আমি কি করবো ? পালাবো এখান থেকে ?'

তিনি ঝুঁটি ধরে আমায় বাইরের ঘরে নিয়ে এসে দোরের পেছনে একখানা চেয়ারে বসিয়ে, মিঠে-কড়া একটু বকুনি দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু করতে হবে না। চুপচাপ এখানে বসে থাক্।'

সেখানে বসে পর্দার আড়াল থেকে সবই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। মার্ডস্টোন তাঁর গোমড়ামুখো বোনকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। পেছন পেছন ঠাকুরমা। একখানা আরামকেদারার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি তাঁদের বসতে বললেন। নিজেও ওঁদের মুখোমুখি আর একটি আসনে বসলেন।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। প্রথমে কথা কইলেন আমার বাবা। কোনোরকম ভণিতা না করেই তিনি বললেন, 'তা হলে ঐ বদমাশটা চাকরি থেকে পালিয়ে এখানে এসে সেঁধিয়েছে! কিছু মনে করবেন না মিস ট্রটউড, ওকে আশ্রয় দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেন নি। সত্যি কথা বলতে কি, কপারফিল্ডের বিধবাকে বিয়ে করার পর থেকেই এই ছেলেটা আমাদের সুখ-শান্তির পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মানে—'

কথাটা শেষ হবার আগেই খরখরে গলায় পিসী ফোঁড়ন কাটলেন, 'ছেলেটার স্বভাব-চরিত্রও এমন বেয়াড়া যে, কেবল আমরা বলেই তা এতকাল সহ্য করেছি। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, পড়াশোনায় এক নম্বর ফাঁকিবাজ, অসম্ভব রকমের ছিঁচকাদুনে আর মা-সোহাগী। ওকে মানুষ করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছে আমার ভাই, কিন্তু গাধা পিটিয়ে কি ঘোড়া করা যায় ? সালেম-হাউসের মতো ইস্কুল, সেখানেও বদনাম কুড়িয়ে এসেছে। মাস্টাররাও ওকে দু'চোখে দেখতে পারতো না। বাধ্য হয়েই ইস্কুল ছাড়িয়ে চমৎকার একটি কাজে লাগিয়ে দেওয়া

হলো। কিন্তু দেখুন কাণ্ড! বলা নেই কওয়া নেই ফুশ করে করে সেখানে থেকে হাওয়া। এমন বখাটেকে কে বিশ্বাস করবে বলুন! মাফ করবেন মিস্ ট্রটউড, ছুনিয়ার সবচেয়ে ওঁচা ছেলেদের মধ্যে একদম পয়লা নম্বর আপনার এই নাতিটি।'

ঠাকুরমা মুচকি হেসে বললেন. 'যা বলেছেন, তবে এরকম ডানপিটে ছেলেই কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি মিস্ মার্ডস্টোন।'

মিস্টার মার্ডস্টোন এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। এবার মুখ খুললেন, 'এমন ছেলেকে আপনি বাহবা দিচ্ছেন মিস্ ট্রটউড? শক্ত, ডানপিটে বলে মাথায় তুলছেন? শক্ত ছেলেরা কি এভাবে গরুর মতো নিজের আখের নষ্ট করে? চাকরি ছেড়ে পালিয়ে বাউণ্ডুলের মতো আপনার দয়ার ভিখিরি হয়েবেঁচে থাকতে চায়? আসলে পড়াশোনা, কাজকর্ম কিছুই ওর ভালো লাগে না। নিষ্কর্মার ঢেঁকি হয়ে পরের ঘাড়ে বসে ছুবেলা ভাত মারাই ওর স্বভাব। না, না, আপনি ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। দিলে উপকারের চেয়ে ওর ক্ষতিই করবেন বেশি —একথা আমি জোর গলায়ই বলতে পারি। আমার হাতে ওকে ছেড়ে দিন, টিট করে ছেড়ে দিচ্ছি।'

ঠাকুরমা একেবারে চুপচাপ। চোখ ছুটি বোজা। মুখে টু শব্দটি নেই।

মার্ডস্টোন বলেই চললেন, 'আমরা অবশ্য ওকে নিয়ে যেতেই এসেছি। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে পারেন তো ভালোই, না হলে আমার বাড়ির দরজা চিরদিনের মতো ওর জন্য বন্ধ হয়ে গেলো মনে রাখবেন এবং এর জন্য আপনিও নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী থাকবেন।'

এবার ঠাকুরমা চোখ খুললেন। তাঁর সমস্ত মুখখানা কঠিন হয়ে উঠেছে। একটা দারুণ উত্তেজনায় সারা শরীর যেন কাঁপছে। ইশারায় তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'তোমার কি ইচ্ছে ডেভিড? যাবে এঁদের সঙ্গে?'

আমি কাঁপা গলায় বললাম, 'না ঠাকু'মা, কক্ষণো না। ওঁদের হাতে পড়লে একদিনও আমি বাঁচবো না।'

ঠাকুরমা ঘাড় উঁচু করে এবার স্পষ্ট চোখে ওঁদের দিকে চাইলেন। কঠিন গলায়, প্রত্যেকটি কথা পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে করতে বললেন, 'আপনাদের কথা শেষ হয়েছে আশা করি। এখন আপনারা আমার ঘর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেই আমি খুশি হবো। আশা করি জীবনে আপনাদের মুখ আর আমাকে দেখতে হবে না।'

কয়েকটি মুহূর্ত থ' হয়ে বসে থেকে মিস্টার মার্ডস্টোন আর তাঁর বোন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দম দেওয়া কাঠের পুতুলের মতো এক পা, দু'পা করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

এবার ঠাকুরমা আমার লেখাপড়ার দিকে মন দিলেন। তাঁর কেমন যেন একটা জেদ চেপে গেল আমাকে দশজনের একজন তিনি করবেনই। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ক্যাণ্টারবেরী ইস্কুলে পড়তে চাই কিনা। ক্যাণ্টারবেরী! সে তো আমার কাছে স্বপ্ন। এক কথায়ই আমি রাজী হয়ে গেলাম। ঠাকুরমার সুন্দর একখানা গাড়ি আর ছাইরঙের টাট্টু ঘোড়া ছিলো। পরদিন সকাল দশটায় আমাকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। গাড়ি তিনি নিজেই চালাচ্ছেন, চুপচাপ আমি তাঁর পাশটিতে বসে আছি। মাঝে মাঝে চাবুকের ডগাটি আলতো করে আমার মাথায় ঠুকে তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন লাগছে রে হতভাগা?'

আমিও জবাব দিচ্ছি, 'চমৎকার!'

তিনি মিটির মিটির হাসছেন আর বলছেন, 'চারদিকে চেয়ে ছাখ্ কি সুন্দর!' সত্যি, মনের এমন স্ফূর্তি অনেকদিন পাইনি।

যথাসময়ে ক্যাণ্টারবেরীতে এসে হাজির হলাম। অদ্ভুত ধরনের একটি সেকেলে বড় বাড়ির সামনে গাড়ি থামলো। নীচু নীচু জানালা ও ঝুল-বারান্দা সমেত বাড়িখানা যেন রাস্তার উপর বেশ কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কি আমার স্কুল?'

তিনি বললেন, 'না। এখানে উইকফিল্ড বলে এক উকীল ভদ্রলোক থাকেন। এখানকার অনেক বড়লোকের বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করেন তিনি। এটি তাঁর আপিস। তোর পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব।'

গাড়ির শব্দ শুনেই একটি মুখ নীচের তলায় গোল ঘরটির জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই সুট করে সরে গেল। একটু পরেই সদর দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। এমন বিদঘুটে চেহারার মানুষ আমি কখনো দেখিনি। চাঁছা-ছোলা শরীর, কাঠির মতো হাত-পা, সাতজন্ম খেতে-না-পাওয়া, মরার মতো ফ্যাকাশে মুখ, পাতলা-পাতলা লালচে কদমছাঁট চুল, ক্ষুদে ক্ষুদে দুটি কুতকুতে চোখ, না আছে ভুরু, না চোখের পাতায় কোন চুলের বালাই। কাঁধের হাড় দুখানা যেন ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে! মনে হয় বেঢপ, বিতিকিচ্ছি, একটি নরকঙ্কাল যেন চামড়া ঢাকা দিয়ে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে। বয়েস বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ দেখলে পনেরো-ষোলো বছরের খোকা-খোকা মনে হয়। লোকটাকে দেখে আমি তো তাজ্জব!

ঠাকুরমা বললেন, 'মিস্টার উইকফিল্ড কি বাড়ি আছেন ইউরিয়া হিপ?'

'ইউরিয়া হিপ!' এমন অদ্ভুত নামও জীবনে কখনো শুনিনি।

হিপ জবাব দিলো, 'হ্যাঁ আছেন। ভেতরে আসুন।'

উইকফিল্ড সাহেবের সঙ্গে ঠাকুরমার অনেক দিনের পরিচয়। ভদ্রলোক ভেবেছিলেন আইন-ঘটিত কোনো ব্যাপার নিয়েই হয়ত ঠাকুরমা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু ঠাকুরমা বললেন, 'তা নয়। এই ছেলেটির বিষয়ে কিছু কথাবার্তার জন্য এসেছি। এটি আমার নাতি।'

উইকফিল্ড বললেন, 'আপনার কোনো নাতি আছে বলে তো শুনিনি!'

ঠাকুরমা বললেন, 'ঠিক নিজের নয়। আমার ভাইপোর ছেলে। আমি পুষ্যি নিয়েছি। ওকে এখানকার কোনো ভাল স্কুলে ভর্তি করতে চাই।'

উইকফিল্ড বললেন, 'সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।'

ঠাকুরমা বললেন, 'তা না হয় হলো, কিন্তু ছেলেটি থাকবে কোথায় ? কোনো বোর্ডিং-এ রেখে পড়ানো আমার ইচ্ছে নয়।'

উইকফিল্ড বললেন, 'কেন ? আমার বাড়িতে ! আমার এখানে ওর কোনো কষ্ট হবে না। আপনি তো সবই জানেন। আসুন বাড়ির ভেতর, আমার ছোট্ট গৃহকর্ত্রীটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

ঘরের এককোণে একটি টেবিলের ধারে মাথা গুঁজে বসে কাজ করছিল ইউরিয়া হিপ। ভাবছিলাম সে হয়ত আমাদের দিকে নজরই দিচ্ছে না। কিন্তু একটু পরেই বুঝলাম তা নয়। অন্যদিকে চেয়ে থাকার ভান করে বিদঘুটে চোখ দুটি দিয়ে আড়ে আড়ে সে আমাদের প্রতিটি চাল-চলন লক্ষ্য করছিলো। এমনকি কলমটি বাগিয়ে ধরে একমনে যখন কাগজে আঁচড় কেটে চলেছে বলে মনে হচ্ছিলো, তখনও।

সুন্দর একটি পুরোনো সিঁড়ি ভেঙে আমরা তিনজন দোতলায় বৈঠকখানায় উঠে এলাম। তিন-চারটি খোলা জানালার আলোয় ঘরটি যেন হাসছে। আওয়াজ পেয়েই প্রায় আমারই বয়সী একটি মেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। মেয়েটি দেখতে যেমন মিষ্টি তেমনি ধীর-স্থির, শান্ত ! হাসি-হাসি মুখখানিতে একটি উজ্জ্বল আনন্দের আভা। একবার দেখলে আর যেন তাকে ভোলা যায় না।

উইকফিল্ড বললেন, 'এইটিই আমার মা-হারা মেয়ে অ্যানিস। এর কথাই বলছিলাম। আমার দুর্ভাগা জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা।'

অ্যানিস লাজুক-লাজুক চোখে একবার আমার দিকে আর একবার ঠাকুরমার দিকে চাইলো। ঠাকুরমা তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিলেন। আদর করে কপালে চুমো খেলেন। উইকফিল্ড ঠাকুরমাকে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে বললেন। কিন্তু ঠাকুরমা রাজী হলেন না। কয়েক মিনিট পরেই তিনি ডোভারের দিকে রওনা হলেন। আমাকে বললেন, 'ডেভিড, এখানে তোমার কোনো কষ্ট

হবে না। যাবার আগে শুধু তিনটি কথা বলে যাই, মনে রেখো। জীবনে কখনো নীচ কাজ করো না, মিথ্যে কথা বলো না আর কারো প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। তবেই তুমি বড় হতে পারবে।'

আমার চোখ জলে ভরে উঠছিলো। তবু কোনমতে বললাম, 'তোমার প্রতিটি কথা আজীবন আমি মনে রাখব ঠাকুরমা।'

সেইদিন উইকফিল্ড সাহেব আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আমার নতুন মাস্টার ডক্টর স্ট্রং-এর সাঙ্গেও আলাপ হলো। মনটা বেশ ভাল লাগছিলো। সন্ধ্যায় উইকফিল্ড ও অ্যানিস-এর সাথে একসঙ্গে বসে খেলাম। অনেক গল্প-গুজবের পর নীচে এসে দেখি হিপ জানালার ছিটকিনি তুলে আপিস বন্ধ করছে। ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গে দুটো কথা কইতেই হলো। যাবার সময় করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালাম। উঃ রে, বাপ্ রে! জেলি মাছের মত কি বিশ্রী, স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ওর হাত! ছোঁয়ায় সারা শরীরটা যেন ঘিনঘিন করে উঠলো!

লোকটাকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখিনি। এবার যেন আরো খারাপ লাগলো।

২

পরদিন থেকেই ক্যান্টারবেরীতে আমার ছাত্রজীবন শুরু হয়ে গেল। ক্লাশে প্রায় পঁচিশ জন ছেলে। স্ট্রং সাহেব সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেই সর্দার ছেলেটি হাত ধরে আমাকে জায়গামতো নিয়ে বসিয়ে দিল। তার ব্যবহার খুব ভদ্র আর কথাবার্তাও কি মিষ্টি। সালেম-হাউসের কথা মনে পড়লো। সেখানে মাস্টার বা ছেলে কারো সঙ্গেই যেন মন খুলে মেশা যেতো না। সকলের মধ্যে থেকেও সবার সঙ্গেই

যেন আড়াল থেকে যেত। বন্ধুত্ব দূরে থাক, এক-আধজন ছাড়া কারো সাথে যেন কথা কইতেই ইচ্ছে হতো না। গ্রীনবী কোম্পানিতেও সেই একই হাল। সারাদিন মুখ বুজে কাজ করে বাড়ি ফিরেও সমবয়সী এমন কাউকে পেতাম না যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। খেলাধুলো, লাফালাফি, ছুটোছুটি আমার কাছে ছিলো স্বপ্নের মতো। ফলে, আমি যেন বেশ একটু কুনো হয়ে পড়েছিলাম। নিজেকে নিজের কাছেই কেমন যেন কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হতো। এখানে এসে সে ভাবটা কেটে গেল। এখানকার ছেলেগুলো যেমন হাসিখুশি তেমনি মিশুকে। আর ডক্টর স্ট্রং-এর তো কথাই নেই। শহরশুদ্ধ সবাই এখানে তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে। আর একটি আশ্চর্য আকর্ষণ অ্যানিস। বড় ভালো মেয়েটি। বড় মমতাময়ী, আমার আদর-যত্ন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তার কড়া নজর। লেখা-পড়া নিজে খুব বেশি শেখেনি, কিন্তু আমাকে উৎসাহ দিতে ওস্তাদ। সত্যি কথা বলতে কি, অনেকদিন পড়াশোনা বন্ধ থাকার ফলে যে সব জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম, এই ছোট্ট মেয়েটির উৎসাহেই অল্প দিনের মধ্যেই আবার সে সব সড়গড় হয়ে গেল। উইকফিল্ডও আমাকে ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। কাজেই প্রথম প্রথম একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব থাকলেও শীগগিরই আমি ঐ পরিবারের আপনজন হয়ে উঠলাম।

একদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় হিপ-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি টেবিলের ধারে বসে সে খুব মনোযোগের সঙ্গে ইয়া-মোটা একখানা বই পড়ছে, আর শামুকের শুঁড়ের মতো তার বিতিকিচ্ছিরি স্যাতস্যাতে আঙুলে ধরা একটি রঙিন পেনসিল দিয়ে মাঝে মাঝে কোনো লাইনের তলায় দাগ টানছে। আমি পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অভদ্রতা হবে ভেবে ওকে বলে ফেললাম, 'কি! আজ এত রাত অবধি কাজ করছেন যে?'

লোকটা হাসতেই জানে না। তবু হাসির মতো অদ্ভুত একটা

ভঙ্গী করে বললো, 'কি আর করি ! আপনাদের জুতোর সুখতলার মতো দীনহীন মানুষ আমি। আইন বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করছি। ভবিষ্যতে হয়ত কাজে লাগবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো শুনেছি আপনি এরই মধ্যে দস্তুর-মতো একজন ঝানু উকিল হয়ে উঠেছেন !'

পকেট থেকে আধময়লা একখানা রুমাল বের করে সে তার নোংরা ভিজে ভিজে হাত দুখানা মুছতে মুছতে বললো, 'কি যে বলেন ! আগেই বলেছি আমি হলাম গিয়ে চাল-চুলোহীন নাচার মানুষ। যমেরও অরুচি। আমার মা-বেচারাও তাই। নড়বড়ে একখানা কুঁড়ে ঘরের তলায় কোনমতে আমরা মাথা গুঁজে আছি, হেঁ হেঁ হেঁ···কিন্তু সে জন্য ভাগ্যের ওপর আমার কোনো নালিশ নেই স্যার। উইকফিল্ড সাহেবের দয়ায় এটুকুনও যে পাচ্ছি তাতেই আমরা ধন্য।'

লোকটার ভাঁড়ামিতে পিত্তি জ্বলে উঠছিলো, তবু মুখে একটু নকল হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'মিস্টার উইকফিল্ডের কাছে কতদিন আছেন?'

সে জবাব দিলো, 'তা একেবারে অল্প দিন নয়। বছর চারেক হবে।'

আমি বললাম, 'ভাগ্যে থাকলে একদিন আপনি তাঁর ব্যবসার একজন অংশীদারও হয়ে উঠতে পারেন। তখন হয়তো এ কারবারের নাম 'উইকফিল্ড অ্যাণ্ড হিপ' হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। কি বলেন !'

হঠাৎ দু'হাত কচলিয়ে, গা-গলা মুচড়িয়ে সাপের মতো এমন একটা বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করলো সে, যে অনেক কষ্টে আমাকে হাসি চাপতে হলো। একটু পরেই গদগদ গলায় সে বললো, 'আজ্ঞে না, না, ও কথা বলতে নেই। আমি হলাম তাঁর দাসানুদাস। ও রকম কোনো স্বপ্ন আমার নেই, দেখাও সাজে না। বড় মহাপ্রাণ মানুষ এই উইকফিল্ড সাহেব, হেঁ হেঁ হেঁ। ভগবান্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

আপনার ঠাকুরমাটিও নিপাট ভালমানুষ। একেবারে স্বর্গের দেবী। মিস অ্যানিসের ওপর তাঁর কি অগাধ ভালবাসা!'

আমি কৌতুকের সঙ্গে বললাম, 'ধন্যবাদ। অ্যানিসের মতো মেয়েকে কে না ভালবেসে পারে বলুন!'

সে বললো, 'সে তো একশোবার। আহা, আপনার মুখে এ কথা শুনে কি ভাষায় যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। হেঁ · হেঁ···হেঁ।'

আবার সেই একই ভাবে শরীর দোলাতে দোলাতে টুল থেকে উঠে দাঁড়ালো হিপ। বললো, 'নমস্কার, এবার বাড়ির দিকে পা বাড়াবো। মা বেটি পথ চেয়ে বসে আছে। খেতে না পেলে কি হবে স্যার, মায়ে-পোয়ে আমাদের বড্ড ভাব। একদিন যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন গরিবের ঘরে, মানে সামান্য এক কাপ চা খেয়ে কৃতার্থ করেন আমাদের, দুজনেই ধন্য হবো আমরা, হেঁ হেঁ হে···'

আমি বললাম, 'তার জন্য এত ভনিতার দরকার কি? নিশ্চয়ই যাব একদিন।'

৩

দিন কয়েক পরে উইকফিল্ড সাহেবের অনুমতি নিয়ে একদিন সন্ধ্যের দিকে সত্যি সত্যি ওর আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। দেখেই ল্যাজ-নাচানো পোষা কুকুরের মতো লোকটা এমন ন্যাওটা-পনা শুরু করে দিলো যে, বিরক্তিতে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। যত বলি, আরে থামুন, থামুন, ততই সে আরো বেশি করে বলতে লাগলো, 'কি সৌভাগ্য! তাহলে আমাদের মতো উইয়ে-খাওয়া, পুঁয়ে-পাওয়া গরিবের বাড়িতে-ও আপনার মতো লোকের পায়ের ধুলো পড়লো।'

শেষ পর্যন্ত বেশ মিঠেকড়া গোছের একটা ধমক দিয়েই ওকে চুপ করাতে হলো। এর মধ্যে আইনের পড়াশোনায় সে আরো এগিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

সে বললো, 'না, তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাঁ, সামান্য কিছু এগিয়েছি।'

আমি বললাম, 'বেশ।'

নীচু পুরোনো ধরনের ঘুপসি একটি ঘর। তাতেই ওরা মায়ে-ছেলেয় থাকে। মা'টিও হুবহু হিপ-এরই প্রতিমূর্তি, কেবল মাথায় আরো কিছুটা খাটো। ছেলের মতোই তিনিও হাত কচলাতে-কচলাতে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, তারপর মুখখানা কাচুমাচু করে বললেন, 'আমরা গরিব-গরবা মানুষ, চিরদিন এইভাবেই থাকতে চাই, তাতেই আমরা খুশি' ইত্যাদি।

উত্তরে আমি কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। একটু পরেই তিনি তাঁর বাপের বাড়ির গল্প ফেঁদে বসলেন। তাঁর ক'টি বোন, ক'জন পিসী, কাকা-কাকী, কে কোথায় থাকেন, কে কেমন মানুষ—সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগলেন। অগত্যা আমাকেও আমার কথা কিছু বলতে হলো। কথায় কথায় আমার নতুন বাবার কথাও এসে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। মনে পড়লো, যাওয়ার সময় ঠাকুরমা আমাকে পইপই করে এ-বিষয়ে কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলতে বারণ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা। মিষ্টির উপর বসা মাছি যেমন তাড়িয়ে দিলেও বারবার সেখানে এসে বসে, তেমনি নতুন বাবার কথায়ই তিনি ঘুরে ফিরে আসতে লাগলেন আর একথা-সেকথায় ভুলিয়ে আমার মুখ থেকে একটু একটু করে প্রায় সব কথাই জেনে নিলেন। ঠাকুরমাকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না ভেবে নিজের ওপরই ভারী রাগ হলো। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা

উচিত নয় মনে করে উঠেই পড়ছিলাম, হঠাৎ অভাবনার ভাবনা! মিস্টার মিকাবর এসে সশরীরে সে ঘরে ঢুকলেন: 'আরে, কপারফিল্ড যে! এখানে তুমি!'

আমিও তেমনি ভাবেই বলে উঠলাম, 'আপনি!'

তিনি বললেন, 'এ পথে যাচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে তোমায় দেখে ঢুকে পড়লাম।' অগত্যা হিপ ও তার মায়ের সঙ্গে মিকাবর সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিতে হলো।

মিকাবর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তারপর? এখানে কি করছো? সেই মদের কোম্পানিতেই আছ তো?'

ইচ্ছে ছিলো না এদের সামনে এ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কোনমতে কথাটা চাপা দেবার জন্য বললাম, 'না, এখানে আমি ডক্টর স্ট্রং-এর ইস্কুলে পড়ি।'

মিকাবর বললেন, 'পড়ছো? খুব ভালো। ভারী আনন্দ হলো শুনে।'

সরে পড়বার আর কোনো অজুহাত না পেয়ে চট করে আমি বলে উঠলাম, 'কতদিন পরে আপনাকে দেখলাম। চলুন মিসেস্ মিকাবরের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

তিনি বললেন, 'যাবে? চলো, চলো, তিনিও তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হাত কচলাতে-কচলাতে মিসেস্ হিপ বললেন, 'এক্ষণি যাবেন? আবার আসবেন কিন্তু, নমস্কার। আমরা আপনার গোলামের গোলাম, মনে রাখবেন মিস্টার কপারফিল্ড।'

মিকাবরের হাত ধরে ততক্ষণ আমরা ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে এসে পড়েছি। উঃ! এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এই নোংরা পরিবেশ থেকে বাইরে আসার জন্য মনটা ছটফট করছিলো,

কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেঁচে থাকুন মিকাবর সাহেব। তিনিই আমাকে বাঁচালেন।

কাছেই একটা ছোট সরাইখানায় মিকাবর উঠেছিলেন। মিসেস্ মিকাবর একটি ছোট সোফায় চুপচাপ বসেছিলেন। আমাকে দেখে যেন একটু অবাকই হলেন। মিকাবর বললেন, 'বসো, আমি এখনই আসছি।'

তিনি বাইরে যেতেই আমি মিসেস্‌কে বললাম, 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা প্লেমাথেই আছেন।'

তিনি বললেন, স্বামীকে নিয়ে তিনি প্লিমাথে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলেন তার কিছুই হয়নি। সেখানে কাজের লোকের কোন কদর নেই, কেবল যো-হুকুমেরই পোয়াবারো। কাজেই আবার লণ্ডনেই ফিরতে হলো। সেখান থেকে আবার গেলাম মেডওয়েতে। কয়লার কারবারে কোনো কাজ জোগাড়ের আশায়। কিন্তু সেখানেও কিছু হলো না। সাত-পাঁচ ভেবে শেষটায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এরকম একটি বড় শহরে যদি কিছু সুবিধা হয় সেই ফিকিরে। আজ তিন-চারদিন হয়ে গেলো তবু সুযোগ-সুবিধে কিছুই হয়নি। হোটেলের দেনা মেটাবার কড়িটুকু পর্যন্ত নেই। লণ্ডন থেকে কিছু টাকা আসবে এই আশায় তাঁরা বসে আছেন।

শুনে মনটা দুঃখে ভরে উঠলো, কিন্তু কি আর করতে পারি? তবু মুখে মিসেস্ মিকাবরকে কিছু আশ্বাস দিয়ে থমথমে মুখে আমি বিদায় নিলাম।

বাড়ি ফিরে চুপচাপ ঘরের ভেতর বসে আছি, হঠাৎ দেখি মিস্টার মিকাবর হিপ-এর হাত ধরে মৌজে গল্প করতে করতে চলেছেন। এ আবার কি ব্যাপার? মিকাবরের সঙ্গে হিপ-এর এতটা মাখামাখি তো দূরের কথা, আলাপ-পরিচয়ই বা কবে হলো কিছুই জানতাম না।

পরদিন মিকাবর আমাকে রাত্রে তাঁর সাথে খেতে নেমন্তন্ন করলেন। গিয়ে দেখি হিপও সেখানে উপস্থিত। মিকাবর কোনো ভনিতা না করেই বললেন, জানো কপারফিল্ড, তোমার বন্ধু এই ইউরিয়া হিপ একটি চমৎকার মানুষ। যেমন চালাক-চতুর তেমনি চটপটে। দেখতে ছোটখাটো হলে কি হবে, পাকা একটি ছুঁদে অ্যাটর্নি-জেনারেল হওয়ার হিম্মত রাখে। আমার চরম দুঃখের দিনগুলিতে যদি এর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটতো তবে খাতকদের হাতে পড়ে আজকের এই নাজেহাল অবস্থাটি কক্ষণো হতো না, বুঝলে ?'

বুঝব কি মাথামুণ্ডু ! কথা শুনে আমি যেন হকচকিয়ে গেলাম। পাওনাদারদের তো একটি পয়সাও ঠেকাতে হয়নি ভদ্রলোককে। তবে এসব বলছেন কি তিনি ? ঢোক গিলে কথাটা হজম করে তখনকার মতো চুপ করে গেলাম। খেতে খেতে তাঁরা দুজনে অনেক খোসগল্প করতে লাগলেন। আমিও ভদ্রতার খাতিরে একটু-আধটু 'হাঁ-হুঁ' করে যেতে লাগলাম।

পরদিন আরো অবাক হলাম যখন দেখলাম মিকাবর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে হিপ-এর সঙ্গে সকালেই লণ্ডন রওনা হচ্ছেন। এ আবার কি রহস্য ? কাল খাওয়ার সময় দুজনের কথাবার্তায় ঘুণাক্ষরেও এমন কোনো আভাস পাইনি তো ! তবে ?

তৃতীয় অধ্যায়

১

কয়েক বৎসর পর যথাসময়ে আমার ক্যান্টারবেরীর স্কুলজীবন শেষ হলো। সেখানে থেকে ডিগ্রি নিয়ে আমি ডোভারে ফিরলাম। খুশিতে ঠাকুরমার যেন কয়েক বছর বয়স কমে গেল। ছেলেমানুষের মতো লাফাতে লাগলেন তিনি। আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতে বললেন, 'বলিনি, আমার ডেভি সোনার ছেলে? তোর ঐ বেয়াক্কেলে বাপ আর পিসীটাকে কালই খবর পাঠাচ্ছি, দাঁড়া। শুনে ওদের থোঁতামুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে, না রে?'

আমি আর কি বলব? ঠাকুমা'র মুখ রাখতে পেরেছি, এই যথেষ্ট।

ঠাকুরমা বললেন, 'এবার কি করবি? কি তোর ইচ্ছে?'

সত্যিকথা বলতে কি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তখনো ভাবিনি। সবে তো পাশ করে বেরিয়েছি!

ঠাকুরমা বললেন, 'সে সব যা হয় পরে ভাবা যাবে। এখন কয়েকটি দিন তুই বরং কোথাও একটু ঘুরে-টুরে আয়।'

আমিও ঠিক এইটিই চাইছিলাম: কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?

ঠাকুরমা বললেন, 'ঐ যে বিদঘুটে ধরনের নাম, জালার মতো মুটকি মেয়েটা তোর মায়ের কাছে থাকতো, এখন কোন ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে যেন আছে, সেখান থেকেই না হয় কয়েকদিন বেড়িয়ে আয় না।'

বুঝলাম তিনি পেগটির কথা বলছেন। তিনি আরো বললেন, 'লণ্ডন তো পথেই পড়বে। খুশি হলে ওখানেও কয়েক দিন কাটিয়ে আসতে পারিস।'

ঠাকুরমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো। তিনি ঠিক আমার মনের কথাটিই বলেছেন। আহ্লাদে আমি যেন নেচে উঠলাম। ভেবে খুব আনন্দ আর গর্ব হলো যে, আমি আর এখন সেই ছোট্ট ডেভিডটি নেই। এখন আমি যৌবনের কোঠায় পা দিয়েছি, ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছি, দস্তুরমতো স্বাধীন। ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারি।

যাবার সময় ঠাকুরমা শুধু আদরই করলেন না, পকেট ভর্তি টাকা আর কয়েক প্রস্থ মানানসই পোশাক-পত্তরও তৈরি করিয়ে দিলেন।

প্রথমেই আমি ক্যান্টারবেরীতে নামলাম। ইস্কুল ছাড়ার পর অনেকদিন অ্যানিস আর উইকফিল্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমাকে দেখে দুজনেই বেজায় খুশি। অ্যানিসের আনন্দ যেন আরো বেশি। উইকফিল্ড যেন আর সেই আগের মানুষটি নেই। হঠাৎ যেন বেশ কিছুটা বুড়িয়ে গেছেন। সাথে সাথে একটু গম্ভীর আর মনমরাও। বাড়িখানারও যেন কেমন ছন্নছাড়া ভাব। ব্যাপার কি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সুযোগ খুঁজছি অ্যানিসকে জিজ্ঞেস করবো। তার আগে সে নিজেই একদিন আমাকে বলে ফেললো কথাটা। আমাকে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে, চুপি চুপি দোর-জানালা বন্ধ করে ফিসফিস করে বললো, 'বাবা কি অদ্ভুতভাবে বদলে গেছেন নিশ্চয়ই তোমার চোখ এড়ায়নি।'

আমি বললাম, 'না। কিন্তু কেন বলো তো! অমন ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, বেশ কিছুটা খিটখিটেও হয়ে গেছেন দেখছি!'

অ্যানিস কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো, 'শুধু তাই নয়, ইদানীং তিনি মানসিক অবসাদেও ভুগছেন। কথা কইতেও যেন কষ্ট হয়, হাত-পা থরথর করে কাঁপে। আগে দিনরাত খাটতেন, কিন্তু এখন ঐ হিপ-এর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছেন। সে-ই এখন তাঁর আপিসের হর্তা-কর্তা হয়ে বসেছে। মনিবকে যেন আর আমলই

দিতে চায় না। বাবাও কি জানি কেন ধীরে ধীরে ওর হাতের মুঠোয়ই চলে গেছেন। নিজের জোর খাটাতেও যেন ভয় পান।'

শুনে দুঃখে দরদে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। একটি কথাও যেন মুখ দিয়ে বের হলো না। হিপ-এর ওপর এ-রকম একটা সন্দেহ আমার বরাবরই ছিলো। লোকটার অতিভক্তিকে চোরের লক্ষণ বলেই মনে হতো। তলে তলে উইকফিল্ডের কি সর্বনাশ সে করেছে কে জানে?

দুদিন বাদেই আমি লণ্ডনমুখো রওনা হলাম। চার-চারটি তেজি ঘোড়ায় টানা রথ। নাম লণ্ডন-কোচ। ভেতরে না গিয়ে আমি উঁচুতে কোচম্যানের পাশে বসেছি। গায়ে দামী স্যুট, পেটে বেশ কিছু আইনের বিদ্যে আর পকেটে মোটা এক গোছা টাকা! কি ভারিক্কি আর কেউ-কেটাই না মনে হচ্ছিলো নিজেকে!

চেয়ারিং ক্রশ-এ নেমে মধ্য-লণ্ডনের এক দামী হোটেলে গিয়ে উঠলাম। রাতে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাচ্ছি হঠাৎ সামনের বারান্দায় স্টিয়ারফোর্থের সঙ্গে দেখা। প্রথমটায় সে আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি। কিন্তু আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে খানিক বাদে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো: 'তাই বলো! সেই পুঁচকে কপারফিল্ড না?'

দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। কতদিন পরে দেখা। টানতে টানতে ওকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। গরম কফির পেয়ালা সামনে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে গল্প করলাম। কথা যেন আর ফুরোয় না! সালেম-হাউস ছাড়ার পর একটির পর একটি সব ঘটনা ওকে বললাম।

শুনে সে বললো, 'তা হলে তুমি তো এখন ছোটখাটো একটি সলিসিটর-জেনারেল হে! লেখাপড়ায়, টাকা-পয়সায় সমান লক্ষ্মীমন্ত। অমন শাঁসালো ঠাকুরমার পেয়ারের পুষ্যিপুত্তুর হওয়া ক'জনের ভাগ্যে জোটে বলো।'

আমি বললাম, 'তারপর তোমার খবর কি? কি মনে করেই বা হঠাৎ লণ্ডনে?'

সে বললো, সে নিজেও অক্সফোর্ডে আইন পড়ছে। পড়াশোনার ফাঁকে, তার মায়ের কাছে যাবে বলে বেরিয়েছিল। মা লণ্ডনের কাছেই থাকেন। যাবার পথে সখ করে এখানে দু একদিন আছে।

আমি বললাম, 'ভাগ্যিস বেরিয়েছিলে তাই দেখা হলো।'

পরদিনই সে আমায় তার মায়ের কাছে, হাইগেট-এ নিয়ে গেলো। ওর মা মানুষটি একটু রাশভারী, কিন্তু বড্ড মায়াবী। ছেলে যেন ওঁর চোখের মণি। ছেলের বন্ধু হিসেবে আমাকেও ছেলের মতোই যত্ন-আত্তি করলেন। মায়ের আদর জীবনে খুব কমই পেয়েছি, বড্ড ভাল লাগলো।

কথায় কথায় পেগটির কথা উঠলো। স্টিয়ারফোর্থের মা'র ভারী ইচ্ছে আমার সঙ্গে তার ছেলে সেখান থেকেও একটু ঘুরে আসে।

আমি বললাম, 'খুব ভাল কথা। যাবে স্টিয়ারফোর্থ? অমন সুন্দর একটি পরিবার প্রায়ই দেখাই যায় না। খাবার টেবিলেই কথা পাকাপাকি হয়ে গেল, ভোরের ডাকগাড়িতেই আমরা দুই বন্ধু সাফোক হয়ে পেগটিদের বাড়ি রওনা হব।

২

ইচ্ছে করেই কোনো খবর না দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ গিয়ে পেগটিদের চমকে দিতে হবে। তা নইলে মজা কি?

সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় আমরা সাফোক-এ এসে পৌছলাম। সেখান থেকে ইয়ারমাউথ সামান্যই দূর। হেঁটেই যাওয়া যায়। হু হু করে সমুদ্রের বাতাস বইছে। শীত-শীত নির্জন বালিয়াড়ি ভেঙে

দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছি, মনের মধ্যে একটি অদ্ভুত আনন্দ! কতদিন পরে এমিলিকে দেখব! এখন সে আরো কত বড় হয়েছে, আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

স্টিয়ারফোর্থ বললো, 'জায়গাটি সত্যি আশ্চর্য! যেমন আঁধার, তেমনি ছমছমে। শুনছ সমুদ্রের গর্জন? মনে হচ্ছে যেন একটা উপোসী রাক্ষস জিভ বাড়িয়ে টুপ করে আমাদের গিলে ফেলবার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। না?'

আমি হাসলাম। দূরে মিটমিটে একটি আলো দেখা যাচ্ছিল। সে বললো, 'ঐটিই কি ওদের নৌকো-বিলাস?'

আমি বললাম, 'ঠিকই ধরেছো।'

বাড়ির কাছে গিয়ে দুজনেই পা টিপে-টিপে এগোচ্ছি। এক সময় আলগোছে গিয়ে দরজায় হাত রেখে দাঁড়ালাম, তারপর নিঃশব্দে দরজায় ঠেলা দিলাম। দোর খোলাই ছিলো।

ভেতরে পেগটিদের সবাই গোল হয়ে বসে খোশগল্প করছিলো। সামনে আমি, পেছনে স্টিয়ারফোর্থ ঝপ্ করে ঢুকে পড়তেই ওরা তো তাজ্জব। হ্যামই প্রথম আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলো: 'ডেভি, মাস্টার ডেভি এসেছেন। কি সৌভাগ্য!'

চোখের নিমেষে হাসাহাসি আর করমর্দনের ধুম পড়ে গেল। প্রথমে ছুটে এল মিঃ পেগটি আর তাঁর বোনটি। খুশিতে জ্বল-জ্বল করছে তাদের মুখ। একদিন দুদিন নয়, ছ' সাত বছর পরে দেখা! ওরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না সেই বারো বছরের রোগাটে ডেভি এমন দিব্যি সুন্দর একটি নওজোয়ান হয়ে উঠেছে! 'পেগটি' বলে আমি তার কাছে যেতেই সে আমাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। কেন জানি না, তার বুকের সাথে মিশে যেতে যেতে আমার মায়ের কথা মনে পড়লো আর ছেলেমানুষের মতো চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমে এল। আমি যত কাঁদি, সেও আমাকে

বুকের মধ্যে তত চেপে চেপে ধরে। এমন সুখের কান্না আর কাঁদিনি।

স্টিয়ারফোর্থ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। মিঃ পেগটি রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ভারী গলায় এমিলিকে ডাকলেন। স্টিয়ারফোর্থকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনিই হচ্ছেন মাস্টার ডেভির বাল্যবন্ধু যার কথা তার কাছে অনেক শুনেছি। দুজনেই একসঙ্গে আজ এখানে। ভেবে ছাখ, এমন দিন কি তোর কাকার জীবনে আর আসবে?'

স্টিয়ারফোর্থকে বললেন, 'একে ও নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছেন স্যার। এ হলো এমিলি। আমার নিজের তো ছেলেমেয়ে নেই। এইটিই আমার ছেলে বলুন ছেলে, মেয়ে বলুন মেয়ে। মানে ও যে আমার কি, বলে বোঝাতে পারবো না।'

স্টিয়ারফোর্থ কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ বলে ফেললো, 'তা তো নিশ্চয়ই। আমিও সব শুনেছি। আপনার এই ছোট্ট পরীটি একটি সোনার টুকরো মেয়ে।'

মিঃ পেগটি বললেন, 'আমি ছাড়া আরও একজন ওকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। সে হলো হ্যাম। ইচ্ছে আছে আর একটু বড় হলেই ওদের দুটি হাত এক করে দেবো।'

লজ্জায় এমিলি আর হ্যাম দুজনেই লাল হয়ে উঠলো।

স্টিয়ারফোর্থ 'হাঁ' করে এমিলির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিশোরী সবেমাত্র প্রথম যৌবনে পা দিয়েছে। ভরা লাবণ্যে সারা দেহ ঢলঢল করছে। মুখখানা কিন্তু এখনো সেই ছেলেমানুষের মতোই কমনীয় ও পবিত্র। সে ওকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলো। মৃদুকণ্ঠে এমিলি তার জবাব দিলো।

হ্যাম বললো, 'লজ্জা কি? মন খুলে কথা বল না!' শুনে ও যেন লজ্জায় আরো জড়সড় হয়ে গেল।

মিঃ পেগটি হঠাৎ তাঁর মোটা গলায় একখানা গান ধরলেন।

'যখন বাতাস বয়, ঝড়ের বাতাস—মেঘেতে আঁধার হয় দূরের আকাশ—' আহা-মরি না হলেও ওর গলাটি দরাজ। বাইরে বহুদূরে সে গানের রেশ ছড়িয়ে পড়লো।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাতে আমরা বিদায় নিলাম। ওরা বলছিল থাকতে, কিন্তু স্টিয়ারফোর্থকে সাফোক-এ ফিরতেই হবে। কাজেই থাকা হলো না।

পথে স্টিয়ারফোর্থ চুপ করেই ছিলো। এক সময় হঠাৎ বলে উঠল, 'অমন খাসা মেয়ের ঐ নাকি হবু বর? চোঁয়াড়ের মতো দেখতে ঐ কাঠখোট্টাটা?' শুনে রাগে আর বিতৃষ্ণায় আমার মনটা ভরে গেল। কিন্তু কথা না বাড়িয়ে আমি ওর পাশে হেঁটে চললাম।

* * *

এ অঞ্চলে প্রায় পনেরো দিন আমরা রইলাম। দুই বন্ধু প্রায় এক সাথেই থাকতাম, কিন্তু স্টিয়ারফোর্থ হঠাৎ যেন বেশ একটু সমুদ্র-পাগল হয়ে ওঠায় সব সময় তা হয়ে উঠতো না। প্রায়ই সে মিস্টার পেগটির ওখানে যেত। তিনি নৌকো নিয়ে সমুদ্রে বেরোলেই সেও তার সাথে ভেসে পড়তো। নৌকো সে বাইতেও পারত ভালো। আমি ও-বিদ্যেয় আনাড়ি। তা ছাড়া, ও-ভাবে ঢেউয়ের মাথায় দাপাদাপি করে বেড়াতে আমার ভালোও লাগতো না। তাই অনেক সময় আমি একলা হয়েও পড়তাম। এর মধ্যে পেগটি পরিবারের সাথে স্টিয়ারফোর্থ-এর মাখামাখিও বেশ জমে উঠেছিলো। আর একটি জিনিস আমার নজরে পড়েছিলো। ওদের সম্বন্ধে আগের মতো আর প্রাণ খুলে যেন সে আমার সঙ্গে কথা বলে না। অনেক সময়ই মুখ গোমড়া করে থাকে। কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করলে বিশেষ কিছুই ভাঙে না। দায়সারা গোছের একটা জবাব দিয়ে চুপ করে যায়।

একদিন ওখানেই সমুদ্রের পাড়ে আমরা বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'সমুদ্রে বেড়াবার জন্যে একখানা নৌকো কিনেছি আমি।,

আমি তো অবাক। বললাম, 'তাই নাকি ? কিন্তু এমন জায়গায় ? যেখানে জীবনে হয়ত আর আসবেই না তুমি !'

সে বললো, 'জায়গাটিকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি ভাই। মাঝে-মাঝে আসতেই হবে আমাকে। যখন থাকবো না, মিস্টার পেগটির জিম্মায় থাকবে নাওটি।'

খানিক চুপ করে থেকে আবার বললো, 'নাওখানার খাসা একটি নামও দিয়েছি, জান ?'

আমি বললাম, 'কি নাম ?'

সে বললো, 'ছোট্ট এমিলি।'

আমি যেন থ' হয়ে গেলাম। মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। কানের কাছে মুখ এনে স্টিয়ারফোর্থ বললো, 'ঐ যে নাম নিতে না নিতেই সে এইদিকেই আসছে! আর সঙ্গে ঐ হতভাগাটা। যেন জোঁকের মতো লেপ্‌টে আছে একেবারে।'

হ্যাম আর এমিলি হাত ধরাধরি করে সত্যিই এদিকে আসছিলো। হাসি-গল্পে দুটিতে ডগমগ। কাছে এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে দুজনেই একটু হাসলো। স্টিয়ারফোর্থ ভুরু কুঁচকিয়ে একটা অলক্ষুণে দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইলো।

রাত্রেই ঠাকুরমার চিঠি পেলাম। তিনি লণ্ডনে এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে আমি অ্যাটর্নি হই। সে বিষয়ে শিক্ষানবিশীর জন্যে তিনি তাঁর জানাশোনা একটি নামজাদা ফার্ম-এ আমাকে ভর্তি করে দিতে চান। ফি হিসেবে ঢোকার মুখে হাজার টাকা লাগবে। তাও তিনি দেবেন। কালই এ কাজ সেরে তিনি ডোভারে ফিরে যেতে চান।

কাজেই পরদিনই আমাকে লণ্ডনে ফিরতে হলো। স্টিয়ারফোর্থ হাইগেট-এ তার মায়ের কাছে আর আমি আমার ঠাকুরমার হোটেলে চলে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে নিয়ে সেই ফার্ম-এ উপস্থিত হলেন। ফার্মটির নাম 'মেসার্স স্পেনলো অ্যাণ্ড জারকিন্স।'

মালিক দুজন হলেও মিস্টার স্পেনলোই তার প্রধান কর্মকর্তা। ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে এক মাসের শিক্ষানবিশীর জন্য আমি ভর্তি হয়ে গেলাম।

এত অল্প বয়সে এমন একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজেকে যেন বেশ একটু ভারিক্কি গোছেরই মনে হচ্ছিলো। ঠাকুরমা আমার জন্যে টেমস্ নদীর ধারে এক ভদ্রপল্লীতে একটি সুন্দর ছোট-খাটো ফ্ল্যাটও ভাড়া করে রেখেছিলেন। হোটেল-এর পাট চুকিয়ে জিনিস-পত্র নিয়ে সেখানেই গিয়ে উঠলাম। ফ্ল্যাটটির মালিক মিসেস্ ক্রুপ নামে খুব স্নেহময়ী এক ভদ্রমহিলা। আমাকে তাঁর জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুরমা ডোভারে ফিরে গেলেন।

* * *

ক্যাণ্টারবেরী থেকে পাশ করে বেরোনোর পর এই প্রথম আমার স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন শুরু হলো। ঠাকুরমার মুখ রাখার মতো পাকাপোক্ত আইন-ব্যবসায়ী হবার জন্যে আমি উঠে-পড়ে লাগলাম।

দিন কয়েক পর অ্যানিসের একখানা চিঠি এল। সে লিখেছে, সে এখন লণ্ডনে তার বাবার প্রতিনিধি মিস্টার ওয়াটারব্রুক-এর বাসায় আছে। পত্রপাঠ যেন আমি তার সঙ্গে দেখা করি। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেই ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

অ্যানিস-এর চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'ইস্, এ কি হাল হয়েছে তোমার?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, মলিন হেসে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এর মধ্যে ইউরিয়া হিপ-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিনা।'

আমি বললাম, 'না তো। সে কি লণ্ডনেই আছে?'

অ্যানিস বললো, 'লণ্ডনে মানে? সে এখন রোজ এই বাড়িতেই আসে। এর নীচের তলায় তার আপিস। আমার আসার এক সপ্তাহ আগেই সে লণ্ডনে এসেছে। কেন এসেছে জানি না। কিন্তু ডেভিড, আমার ভয় হয়, নিশ্চয়ই সে কোনো একটা বদ মতলব হাসিল করবার ফিকিরে ঘুরছে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মতলবটা কি, আন্দাজ করতে পার?'

সে বললো, 'আমার বিশ্বাস বাবাকে বগলদাবা করে, ভয় দেখিয়ে সে তাঁর কারবারের অংশীদার হতে চলেছে!'

ঘৃণা ও বিরক্তিতে আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'কি! সেই নীচ মোসাহেবটা এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে?'

ধরা গলায় অ্যানিস বললো, 'লোকটা এক নম্বরের ছিচকে শয়তান। শেয়ালের মতো ধূর্ত। চতুর গোয়েন্দার মতো সজাগ। বাইরে ভাব দেখায় যেন আমাদের কেনা গোলাম, কিন্তু কাজ হাসিলের জন্যে না পারে এমন কাজ নেই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তিলে তিলে সে নিজেকে বাবার কাছে এমন করে তুলেছে যে, ওকে না হলে যেন তাঁর কিছুতেই চলবে না। বাবার কারবারের অন্ধি-সন্ধি তার নখদর্পণে। এমন অনেক গোপন কথা সে জানে যার সুযোগ নিয়ে সে এখন তাঁকে অপদস্থ করতে বা বিপদে ফেলতেও পারে। বলতে গেলে তিনি এখন সম্পূর্ণ ওর হাতের মুঠোয়। দস্তুরমতো ওকে ভয় করেই চলেন।'

অ্যানিস কাঁদতে লাগলো। কি করবো কিছুই ভেবে উঠতে পারলাম না।

পরদিন ওয়াটারব্রুক আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। গিয়ে দেখি দিব্যি জমকালো পোশাক পরে ইউরিয়া হিপও ভিজে বেড়ালটির মতো সেখানে বসে আছে। আর একটি নতুন অতিথিও উপস্থিত। আমার সালেম-হাউসের সহপাঠি ট্রাডল্‌স্। ওয়াটারব্রুক

তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই আমি বললাম, 'ওকে আমি চিনি। ও আমার বাল্যবন্ধু।'

ওয়াটারব্রুক বললেন, 'বটে! মিস্টার ট্রাডল্‌স্‌ও আইন-ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশী করছেন। অবসর মতো আমার কারবারেও কিছু সাহায্য করেন।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বন্ধুকে অ্যানিস-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেদিন কথাবার্তা বেশি হলো না। ওর তাড়া ছিলো। একটু পরেই সে চলে গেল।

মনের মধ্যে ক্যান্টারবেরী ও অ্যানিসদের সেই পুরোনো বাড়িটির কত মধুর স্মৃতিই না ভেসে উঠছিলো! ফুলের মতো সুন্দর সেদিনের সেই মেয়েটি আজ দুঃখ ও বিষাদের প্রতিমূর্তি। উইকফিল্ডও হতাশায় দুর্ভাবনায় যেন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ইচ্ছে হচ্ছিল আরো কিছুক্ষণ অ্যানিসের কাছে থাকি, ওকে সান্ত্বনা দেই, কিন্তু ওয়াটারব্রুক তড়িঘড়ি হল-ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেন।

অ্যানিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীচে নামছি, দেখি ইউরিয়া হিপ সিঁড়ির গোড়ায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে। দেখেই গা রি-রি করে উঠছিল, তবু বললাম, 'এই যে মিস্টার হিপ! ভালো আছেন তো?'

সে যেন বেশ একটু খুশিই হলো। বললো, 'কেটে যাচ্ছে আপনার দয়ায়।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার দয়ায়? তা বেশ, চলুন না আমার ওখানে। একটু কফি খেয়ে আসবেন।'

শুনে বিনয়ে যেন একেবারে গলে পড়লো সে। বললো, 'আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। চলুন।'

নামবার মুখে সিঁড়িটা অন্ধকার। একখানা হাত বাড়িয়ে সে আমার হাত ধরলো। ছোঁয়া লাগতেই আমি চমকে উঠলাম। ভিজে ব্যাঙের মতো কি বিশ্রী চটচটে আর ঠাণ্ডা ওর হাত!

ইচ্ছে হচ্ছিল এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিই। কিন্তু ভদ্রতায় বাধলো।

বাড়ি এসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবছি কি করে কথাটা পাড়বো। হঠাৎ ও নিজেই বলে উঠলো, 'আপনি বোধ হয় শুনেছেন কিছুদিন যাবৎ আমার জীবনে উন্নতির কিঞ্চিৎ নতুন পালা-বদল ঘটেছে মাস্টার কপারফিল্ড! থুড়ি, আপনাকে আমার মিস্টার বলাই উচিত।'

ওর কপট বিনয়ে বিরক্ত হয়েও কোনো ভনিতা না করেই বললাম, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনেছি বই কি!'

সে বললো, 'মিস্ অ্যানিসও শুনেছেন। সেজন্যেই আমার আনন্দ আরো বেশি।'

হঠাৎ মনে হলো লোকটা বোধ হয় অ্যানিসের সম্বন্ধে আমার মনের কথাটি টিপে বের করে নিতে চায়। ইচ্ছে হচ্ছিলো বেশ ভালো করে ওকে একটু কড়কে দিই। কিন্তু কি ভেবে, চুপচাপ রইলাম। ও বলে যেতে লাগলো: 'আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে আমি উইকফিল্ড সাহেবের কারবারের অংশীদার হবো। তখন তার নাম হবে উইকফিল্ড অ্যাণ্ড হিপ। মনে আছে? আজ সে কথা পুরোপুরি ফলেছে। হেঁ হেঁ হেঁ,...'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ বলেছিলাম বটে, তবে সত্যি তা হবে এমন ভেবে কিন্তু বলিনি।'

তেমনি ধারা গা-গুলোনো বিশ্রী হাসিতে হাত কচলাতে কচলাতে সে জবাব দিলো, 'আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম? তবে একটি কথা না বলে পারছি না স্যার। সংসারের দীনহীন মানুষরাও অনেক মহৎ লোকের উপকারে আসতে পারে। ধরুন উইকফিল্ড সাহেবেরই কথা। কি সদাশয় মানুষ, অথচ কারবারে ইদানীং কি বোকামীর পরিচয় না দিচ্ছিলেন! আমি ছোট হয়েও তাঁর যে সামান্য

উপকারটুকুও করতে পেরেছি, তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি না থাকলে,…যাক সে কথা। আশা করছি ভবিষ্যতে আরো অনেক উপকারেই তাঁর লাগতে পারবো।'

খানিকটা বাঁকা সুরেই আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সব দিক্ থেকেই।'

শুনে প্রথমটা যেন ও একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই আবার বলতে লাগলো, 'এ কথা বলছি বলে অপরাধ নেবেন না মিস্টার কপারফিল্ড। সত্যি বলছি, আমি না হয়ে আর কোনো ফিকিরবাজ লোক হলে ওঁর অনেক বুদ্ধিহীন কাজের সুযোগ নিয়ে ওঁকে দস্তুরমতো বিপদে ফেলতে বা হাতের মুঠোয় পুরে ফেলতে পারতো। হেঁ হেঁ হেঁ…কেবল আমি বলেই…'

কথাটা শেষ না করেই কুতকুতে চোখ দুটো তুলে সে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে লাগলো। তারপর বললো, 'বিশ্বাস করুন, কেবল আমি বলেই কিছু ফাঁস না করে ক্ষতি, বদনাম আর অপমান থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে চলেছি। তিনি নিজেও তা জানেন। তাই না সামান্য মজুরীগিরি থেকে আজ এই সম্মানের আসনে তিনি নিজ হাতে আমাকে টেনে বসিয়েছেন। এরজন্যে তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। হেঁ হেঁ হেঁ…'

উঃ, মানুষ এত নেমকহারাম হতে পারে? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত নীচে নামতে পারে? ওর কথার ধরনে মনে হচ্ছিল, ওর এ কথাগুলো আরো সাংঘাতিক কোনো কথার ভনিতা যা একটু পরেই সে বলবে। হলোও তাই। শেষ কফিটুকু গলায় ঢেলেই সে একটু নড়েচড়ে বসলো। তারপর শূন্য পেয়ালাটির দিকে চোখ রেখে বলতে লাগলো, 'আপনি ছাড়া আর কাউকে বলিনি কথাটা। এক্ষুণি ফাঁস করে দেবেন না যেন। মানে অ্যানিসকে আমি ভালোবাসি। বলবো কি, ওর স্বর্গীয় মুখখানা অনেকদিন থেকেই আমি মনের মন্দিরে পূজো করে আসছি। ও যখন হেঁটে যায়

তখন মনে হয় নিজের বুকখানা ওর সুন্দর পা দুখানার তলায় বিছিয়ে দিই।'

বলে কি শয়তানটা! ইচ্ছে হচ্ছিলো আগুন-খোঁচানো লোহার শিকখানা গরম করে ওর গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিই। অনেক কষ্টে রাগ সামলিয়ে বললাম, 'এ কথা ওকে জানিয়েছেন কি?'

কুটিল হেসে সে বললো, 'না। আপনিই প্রথম জানলেন। বলার সময় এখনো আসেনি। কেননা, এখনো নিজেকে ঠিক ওর উপযুক্ত করে তুলতে পারিনি। তবে অ্যানিস তার বাবাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। আমি কিভাবে তাঁর উপকার করে চলেছি, নানাভাবে তাঁকে বাঁচিয়ে চলেছি, এ কথা ওর অজানা নয়। জানি, এই জন্যই আজ না হোক কাল, ধীরে ধীরে তারও আমাকে ভালো না বেসে উপায় নেই। সেই শুভদিনটির জন্যই পথ চেয়ে বসে আছি মিস্টার কপারফিল্ড। হেঁ হেঁ হেঁ···'

এতক্ষণে লোকটার এতসব ভনিতার মানে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। অ্যানিসকে বাগিয়ে এই নরপশুটা উইকফিল্ডের সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে চায়।

৩

আমার ফার্ম-এর কর্তা স্পেনলো সাহেব ছিলেন বিপত্নীক। সংসারে আপন বলতে একটিমাত্র মেয়ে। তাকে নিয়ে লণ্ডনের নরউড অঞ্চলে তিনি থাকতেন। এক শনিবার তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেন। মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'মিস্টার কপারফিল্ড! এইটিই আমার মেয়ে, সবে ধন নীলমণি, ডোরা।'

ডোরা! কি সুন্দর নাম! মেয়েটি দেখতেও পরীর মতো সুন্দরী।

সে মুখে কি ছিলো জানি না, দেখামাত্র আমি তাকে ভালোবেসে ফেললাম। আর একটি মহিলার সাথেও পরিচয় হলো। তিনি ডোরার অভিভাবিকা।

নমস্কার জানাবার আগেই সে মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। তিনিও অবাক্। কোনোমতে আমি বললাম, 'কেমন আছেন মিস্ মার্ডস্টোন। আপনাকে এখানে দেখবো ভাবতেই পারিনি। মিস্টার মার্ডস্টোন কেমন অছেন ?'

তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ। দুজনেই আমরা ভালো আছি।'

স্পেনলো সাহেব বুঝলেন আমরা দুজনেই দুজনের পরিচিত। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

মিস্ মার্ডস্টোন বললেন, 'কপারফিল্ড ও আমি দুজনেই দুজনের আত্মীয়। এক সময় কাছাকাছিই ছিলাম। ঘটনাচক্রে দূরে সরে পড়েছি।'

স্পেনলো বললেন, 'তাই নাকি ?'

আমার মনে পড়লো ডোভারে থাকার সময় পেগটির চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম যে, আমাদের সেই ব্লাণ্ডারস্টোন-এর সাবেক বাড়িখানা নিলামে বিক্রি করে দিয়ে আমার নতুন বাবা আর তাঁর এই বোনটি সেখান থেকে সরে পড়েছিলেন। মনটা যেন হু হু করে উঠলো।

পরদিন নরউড থেকে চলে এলাম। ডোরা তার ছোট্ট কুকুর 'জিপ'কে কোলে নিয়ে হাসিমুখে দোরগোড়ায় এসে আমাকে বিদায় দিলো।

ডোরাকে ছেড়ে এসে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। অনেকটা সেই দুঃখ ভোলবার জন্যই পরদিন বন্ধু ট্রাডল্‌সের কাছে গেলাম। গল্পগুজবে মনটা একটু হাল্‌কা হলো। কথায় কথায় তাকে বললাম, 'শুনেছি, তুমি নাকি ব্যারিস্টারী পড়ছো ?'

সে বললো, 'হ্যাঁ, তা পড়ছি বটে, তবে কতদূর কি হবে জানি না। বড্ড দেরিতে শুরু করেছি ভাই। জানো তো সে জন্যে প্রথমেই একশো পাউণ্ড জমা দিতে হয়, সে টাকা জোগাড় করাই আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো।'

আমি বললাম, 'শুনেছিলাম তোমার এক কাকা নাকি তোমাকে মানুষ করেছিলেন!'

সে বললো, 'করে আর যেতে পারলেন কই? আমিও ইস্কুল ছাড়লাম, তিনিও শিঙে ফুঁকলেন। তারপর আদালতের দলিল-পত্র নকল, সাধারণ জ্ঞানের বই লেখা, এ রকম সব টুকিটাকি কাজ করে কষ্টে-সৃষ্টে সেই টাকা জোগাড় করে সবে মাত্র পড়া শুরু করেছি। তাছাড়া, আর একটি ফ্যাসাদও বাধিয়ে বসেছি। একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছি। মেয়েটি অবশ্য হীরের টুকরো। নাম সোফি। পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই বিয়েটা করে ফেলব।'

আমি বললাম, 'তোফা।'

সে বললো, 'বুঝতেই তো পারছো, সে জন্যেই যতটা পারি হিসেব করে চলি। সৎপথে থাকতে চেষ্টা করি। আয় বুঝে ব্যয় করি, বড়লোকদের এড়িয়ে নীচুতলার মানুষের সাথেই মেলামেশা করি। এখানেও মিস্টার ও মিসেস্ মিকাবর নামে এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী আছেন। ছা-পোষা মানুষ। জীবনে অনেক পোড় খেয়েছেন, দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন, তা সত্ত্বেও ভেঙে পড়েননি। তাঁদের আস্তানায়ই আছি। সেখানেই খাই-দাই। তাদেরও সাশ্রয় হয়, আমারও বাইরের থেকে কম খরচে পেটটা ভরে।'

আমি বললাল, 'তাই নাকি? ওঁরা তো আমারও খুব পরিচিত।' বলতে না বলতেই মিকাবর এসে ঘরে ঢুকলেন। বাইরে যতো হাসি-খুশিই দেখান, ভেতরে তিনি যে খুব কষ্টেই আছেন, মুখের দিকে

চাইলেই তা বোঝা যায়। দেখামাত্রই তিনি আমাকে খাবার নেমন্তন্ন করলেন, কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি তা এড়িয়ে গেলাম।

কিছুদিন পরেই ডোরার জন্মদিনে আবার আমার নেমন্তন্ন হলো। এবার বনভোজনের পালা। ডোরাকে ঠিক বন-পরীর মতোই দেখাচ্ছিলো সেখানে। আমি কাছে যেতেই সে বললো, 'সুখবর আছে মিস্টার কপারফিল্ড, মিস্ মার্ডস্টোন এখানে নেই। তিনি তাঁর ভাইয়ের বিয়েতে গেছেন। তিন হপ্তার আগে ফিরবেন না।'

খবরটা সত্যি মুখরোচক। ডোরার কাছেও, আমার কাছেও। বুঝলাম ভদ্রমহিলাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না। বনভোজনের জায়গাটি ভারী সুন্দর। সবুজ ঘাস, গাছগাছালিতে ঢাকা যেন একখানা ছবির মতো। ডোরা আর আমি তন্ময় হয়ে গল্প করছিলাম। এতো ভালো লাগছিল যে, মনে হচ্ছিল এ বনভোজন যেন কখনো শেষ না হয়। কিন্তু একসময় সুখের লগ্নটি সত্যি ফুরিয়ে এলো। বিদায়ের সময় ডোরার নরম হাতখানা মুঠোয় নিয়ে আমি যখন বললাম, 'চলি', সে এমন মিনতি মাখানো চোখে আমার দিকে চাইলো, যেন মনে হলো সে বলতে চায়, 'আমি তোমার'। আমার সমস্ত মন এক অপূর্ব পুলকে ভরে উঠলো।

বাড়ি ফিরেই মনঃস্থির করে ফেললাম, ডোরাকেই আমি বিয়ে করবো। খুশির চোটে অ্যানিসকে তা জানিয়ে লম্বা একখানা চিঠিও লিখে ফেললাম। এখন শুধু ডোরা রাজী হলেই হয়। কথাটা তাকে বলতেই সে বললো, 'তার নিজের কোনো আপত্তি নেই তবে বাবার অনুমতি ছাড়া সে কিছু করবে না। সঙ্গে সঙ্গে এও বললো যে তার বাবার মনের অবস্থা ভেবে এ বিষয়ে আপাততঃ তাকে কিছু না বলাই ভালো। আমিও ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিক।

৪

অনেক দিন স্টিয়ারফোর্থ-এর কোন খবর নেই। দেখা-সাক্ষাৎও বিশেষ হয় না। সে যেন আজকাল আর আগের মতো নেই। বেশ একটু বদলে গেছে। অনেকটা পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। ঘন ঘন পেগটিদের ওখানে যায়। কখন যায়, কখন আসে কিছুই জানতে পারি না।

এর মধ্যে মিকাবর আরো দুর্দশায় পড়েছেন। দেনার দায়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেন উঠে গেছেন। জেলের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে মিস্টার মার্টিমার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বন্ধু ট্রাড্‌ল্‌সও তাঁকে ছেড়ে একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে উঠেছে। দুঃখে মনটা ভরে ওঠে বেচারার জন্য, কিন্তু কি করতে পারি? এই সব নিয়ে ভাবছি, হঠাৎ আচমকা একদিন স্টিয়ারফোর্থ-এর সঙ্গে দেখা। বললাম, 'কি ব্যাপার? একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গিয়েছ যে!'

সে বললো, 'আর বলো কেন? ফুরসৎ পাই না একদম। কিছু খাওয়াতে-টাওয়াতে পার? খিদেয় আগুন জ্বলছে পেটে। সারাদিন কিছু খাইনি। ইয়ার-মাউথ থেকে আসছি।'

—'ইয়ার-মাউথ? কবে গিয়েছিলে সেখানে?'

স্টিয়ারফোর্থ আর কথা বাড়ালো না। জলযোগের পর আমি বললাম, 'আগে জানলে আমিও যেতাম তোমার সঙ্গে। অনেকদিন পেগটিকে দেখিনি। পারো তো চলো না, কালই বেরিয়ে পড়ি।'

সে নারাজ। কেমন যেন আমতা-আমতা করে বললো, 'তুমি একলাই বরং ঘুরে এসো। কাল না গিয়ে পরশু যাও। কালকের দিনটা দুজনে একসঙ্গে কাটাই। কি জানি, পরের দেখাটা আবার কবে ঘটবে।'

আমি ওর হেঁয়ালি বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'তার মানে ?'

সে বললো, 'মানে-ফানে কিছু নেই, এমনই বলছিলাম।'

সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ওর মা বললেন, 'অনেক দিন পর এলে। পড়াশোনায় ডুবে আছো বুঝি!'

আমি বললাম, 'ঠিক তা নয়। স্টিয়ারফোর্থ-এরই পাত্তা পাওয়া যায় না, তাই আসাও হয়ে ওঠে না।'

মিস্ ডার্টল বলে যে মহিলাটি ওদের বাড়ি থাকে, একসময় তিনিও এসে সামনে দাঁড়ালেন। মুখখানা থমথমে, মনে হলো যেন একটু রাগতই। আমাকে নিরিবিলি পেয়ে তিনি স্টিয়ারফোর্থ ইদানিং কোথায় যায়, কি করে, বাইরে কোনো মেয়ে বন্ধু জুটিয়েছে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কথা-বার্তায় স্টিয়ারফোর্থের উপর বেশ একটা ঈর্ষার ভাব প্রকাশ পেলো তাঁর। তবে কি ভদ্রমহিলা ওকে মনে মনে ভালোবাসেন ? মনে হলো, দূর, অসম্ভব। স্টিয়ারফোর্থ-এর চেয়ে অন্ততঃ দশ বছরের বড় এই মহিলাটি। মনে হলো, দুনিয়ায় অসম্ভব বলে হয়ত কিছুই নেই। যাই হোক, আমি মিস্ ডাটল-এর কথাগুলো শুনে গেলাম। বিশেষ কোনো জবাব দিলাম না। শুধু বললাম, 'না, না, সেরকম কিছু হলে নিশ্চয় কানে আসতো।'

তিনি কিন্তু খুব আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হলো না। কেমন যেন একটা চাপা আক্রোশে গজর-গজর করতে লাগলেন। আমি চুপি চুপি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি হে? মহিলাটি এতো চটিতং ?'

সে বললো, 'ভগবান জানেন। মাঝে মাঝে ওর মাথায় শয়তান ভর করে।'

আসার সময় সিঁড়ির মুখে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক গলায় সে বললো, 'কপারফিল্ড, একটা কথা বলবো ভাই। জীবনে যদি কখনো

কোনো কারণে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তুমি অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝো না।'

কথাটা শুনে হঠাৎ যেন কেমন লাগলো। বললাম, 'কেন? হঠাৎ এ কথা বলছো যে! চিরদিন তুমি আমি দুজনে এরকম বন্ধু হয়েই থাকবো।'

লম্বা একটি নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

* * *

ইয়ার-মাউথ পৌঁছুতে পরদিন সন্ধ্যে হয়ে গেলো। কাছেই একটি সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম। আকাশে ভীষণ মেঘ করেছিলো। একটু পরেই বৃষ্টিও শুরু হলো। রাত দশটায়ও যখন জল থামলো না, তখন ঐ দুর্যোগের মধ্যেই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হলো। দূর থেকেই পেগটিদের ঘরের মিটমিটে আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। দোর ভেজানো, কিন্তু খোলাই ছিলো। জল-ঝুপঝুপ বর্ষাতি নিয়েই ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম। আরামদায়ক আগুনের আঁচে ঘরখানা দিব্যি গরম হয়ে আছে। মিস্টার পেগটি সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে আগের মতোই গল্পগুজব করছিলেন। এমিলিকেই কেবল দেখতে পেলাম না।

আমাকে দেখামাত্র মিস্টার পেগটি আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'আরে, আসুন, আসুন। হঠাৎ এ ভাবে, এ সময়? কি আশ্চর্য!' চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন, বসুন স্যার। তারপর ভালো আছেন তো?'

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েই আমি পেগটিকে জড়িয়ে ধরলাম। 'কেমন আছো আমার মা-মণি? ভালো তো?'

সে হাসবে না কাঁদবে কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলো। মিস্ গামিজও খুব খুশি এতোদিন

পর আমায় দেখে। হাসিমুখে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তার আগেই মিস্টার পেগটি ঘড়ির দিকে চেয়ে, একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে জানালার গোড়ায় রাখলেন। আমার দিকে চোখ তুলে বললেন, 'এমিলির ফেরার সময় হয়েছে। অন্ধকারে এ বাতিটি দেখলেই সে বুঝবে এটি তার বাড়ি আর তার কাকাও বাড়িতেই আছেন। সে খুশি মনে এসে বাড়ি ঢুকবে। একটু পরেই তার আসার কথা।'

পেগটি ঠাট্টা করে বললো, 'বয়েস হলে কি হবে? তুমি এখনো একটি রাম-খোকাই আছো।'

প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলেন মিস্টার পেগটি। 'শুনুন স্যার আপনার মা-মণির কথা। এই বপুখানা নিয়েও আমি নাকি রাম খোকা। হাঃ হাঃ—'

হঠাৎ আস্তে দোর খুলে গেলো। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলো হ্যাম। তার মাথায় মস্ত বড় একখানা বর্ষার টুপি। টুপির চার কিনারা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। মনে হলো তার মুখখানা যেন ফ্যাকাশে, হাত-পা টলছে। মিস্টার পেগটি তাকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'তুমি একা যে? এম্লি কই?'

কোনো জবাব না দিয়ে হ্যাম চোখের ইশারায় আমাকে ডাকলো।

বাইরে এসে চুপি চুপি বললাম, 'কি হয়েছে হ্যাম?'

উত্তরে সে শুধু ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলো। কি যেন একটা অজানা ভয়ে আমারও বুক ঢিপঢিপ করছিলো। হ্যামকে তো কখনো কাঁদতে দেখিনি! উত্তেজনায় আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কি হয়েছে হ্যাম, খুলে বলো।'

ছেলেমানুষের মতো এবার সে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরলো। কাঁপা-কাঁপা গলায় কোনোমতে বললো, 'সর্বনাশ হয়েছে মিস্টার ডেভিড, আমার এমিলি আর নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে আমিও চীৎকার করে উঠলাম, 'নেই? কি বলছো তুমি? কোথায় গিয়েছে সে?'

হ্যাম-এর সেই বিবর্ণ মুখ আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। নিঃশব্দে সে বর্ষাতির পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে দিলো। মিস্টার পেগটিও যে কখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন লক্ষ্য করিনি।

মৃত্যুর মতো নিশ্চুপ হয়ে গেছে চারদিক। দুহাতে ওদের দুজনকে ধরে আমি ঘরের ভেতর নিয়ে এলাম। তারপর মোমবাতির সামনে কাগজখানা খুলে ধরলাম। হ্যাঁ, এমিলিরই হাতের লেখা। গোটা গোটা অক্ষরে সে লিখেছে, 'আমার প্রিয়তম কাকামণি, লিখতে আমার হাত কাঁপছে, তবু লিখতে হচ্ছে। একান্ত নিরুপায় হয়েই তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি আমি। এ চিঠি যখন তোমরা পাবে আমি তখন অনেক দূরে। তোমাদের কাছে যা পেয়েছি এমন প্রাণভরা স্নেহ, ভালোবাসা জীবনে খুব কম লোকেই পায়। আমি তার মূল্য দিতে পারলাম না বলে আমাকে ক্ষমা করো। যার সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি, অনেক চেষ্টা করেও তাকে এড়াতে পারলাম না। জানি না, জীবনে আর তোমাদের কাছে ফিরব কি না, যদি ফিরি তার সঙ্গে তার স্ত্রী হয়েই ফিরবো। হ্যামকে বলো, হতভাগিনী এই খারাপ মেয়েটিকে সে যেন ভুলে যায়। তাকে ছেড়ে যেতে আমারও বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবু উপায় নেই। আমি মরে গিয়েছি মনে করে যেন তার মন থেকে আমাকে মুছে ফেলে। ফুলের মতো পবিত্র আর একটি সুন্দর মেয়েকে ভালোবেসে সুখী হয়। শেষ বিদায়ের চোখের জলটুকুই শুধু রেখে গেলাম তোমাদের জন্য, আর হ্যামের জন্য আমার অনন্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস। ইতি—

তোমাদের চিরদিনের এমিলি।'

চিঠির তারিখ আজ থেকে তিনদিন আগের।

পড়া শেষ হলে মিস্টার পেগটি শূন্য চোখে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। কোনোমতে বললেন, 'কিন্তু লোকটি কে? কিছু আন্দাজ করতে পার?'

হ্যাম বললো, 'একটি লোককে আমি সন্দেহ করি মিস্টার ডেভিড। অভয় দেন তো বলি, তাকে আপনিও ভালোভাবেই চেনেন। আপনার বিশেষ বন্ধু।'

মাথার ভেতর যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। আমার বন্ধু? তবে কি স্টিয়ারফোর্থ?

হ্যাম বলতে লাগলো, 'কিছুদিন থেকেই ফিটফাট পোশাক-পরা সেই ভদ্রলোকটি এখানে আনাগোনা করছিলেন। এমিলির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ফেলেছিলেন। কয়েকদিন আগেও এমিলির সঙ্গে তাঁকে দেখেছি। তারপর ভেবেছিলাম সে বুঝি চলে গেছে। কিন্তু না। পরশুর আগের দিনও সন্ধ্যের পর হঠাৎ আবার তাঁকে সরাই-খানার বাইরে সমুদ্রের পারে এমিলিকে নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। সে নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিলো।'

আমার মনে হচ্ছিলো সমস্ত আকাশখানাই যেন হুড়মুড় করে আমার মাথার উপর ভেঙে পড়ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমি বললাম, 'তারপর?'

হ্যাম বললো, 'সেদিনই অনেক রাত্রে একখানা গাড়ি এসে নাকি সরাইখানার সামনে দাঁড়িয়েছিলো। গাড়িখানা এখানকার নয়। মাঝ রাতে তাতে চেপেই লোকটি চলে যায়। মাছ-ধরা জেলেরা কেউ কেউ এমিলিকেও নাকি জড়সড়ো হয়ে তার পাশে বসে থাকতে দেখেছে। ঠিক সেদিন থেকেই এমিলিকে কিন্তু আর এ তল্লাটে দেখা যায়নি। কথাটা আমি এমিলির ভালোর জন্যই গোপন রেখেছিলাম। শুনে একেবারে ভেঙে পড়বেন বলে কাকার কাছেও ভাঙিনি। বলেছিলাম, সে তার এক বান্ধবীর কাছে বেড়াতে গেছে, আজ সন্ধ্যেয় ফিরবে।

কাকা অনেক আশায় সেইজন্যই জানালায় মোমবাতির আলো রেখে জেগে বসে ছিলেন।

অথচ পাগলের মতো ভেতরে ভেতরে আমি তাকে ঠিকই খুঁজে বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যের পর আবার সরাইখানায় গিয়ে ধর্না দিয়েছিলাম। সেখানকার বেয়ারা এই চিঠিখানা আমার হাতে দিলো। এটি নাকি সেই লোকটির বিছানা থেকে পাওয়া গিয়েছে।

উন্মত্তের মতো মিস্টার পেগটি তাঁর মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। আমাকে বললেন. 'আপনার কোনো দোষ নেই মিস্টার কপারফিল্ড। সবই আমার কপাল। নইলে মানুষের মুখোশ পরা ঐ শয়তানটাকে কেন আমি এতখানি বিশ্বাস করবো, বলুন। উঃ, ভগবান্!'

তাঁকে সান্ত্বনা দেবো কি? আমারই তখন বজ্রাহতের মতো অবস্থা।

জামার আস্তিনে চোখের জল মুছে হঠাৎ এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার পেগটি। মোটা কোটখানা গায়ে চাপিয়ে কঠিন গলায় হ্যামকে বললেন, 'টুপিটা দাও।'

ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'এমিলিকে খুঁজে আনতে।'

হ্যাম বললো, 'শান্ত হোন। কোথায় যাবেন আপনি আন্দাজে? যেতে হয় আমরাই তো আছি।'

পিলে-কাঁপানো এক প্রচণ্ড ধমকে তিনি বলে উঠলেন, 'পথ ছাড়ো আমার! আমি যাবোই। দরকার হলে আমার এমিলির জন্যে সারা দুনিয়া চষে ফেলবো আমি। ফিরিয়ে তাকে আমি আনবোই। দরকার হলে সে শয়তানটাকে খুন করবো আমি, হ্যাঁ খুন!'

হঠাৎ যেন আমার চেতনা ফিরে এলো। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে আমি মিস্টার পেগটির কাঁধে হাত রাখলাম। বললাম, 'অধীর হয়ে কোনো লাভ নেই এখন। ওতে ভালোর চেয়ে মন্দই হবে বেশি।

ঠাণ্ডা মাথায় এখন ভেবে দেখতে হবে কি করা যায়। কাল সকালে আপনি ও হ্যাম দুজনেই আমার সঙ্গে লণ্ডন চলুন। মনে হয় স্টিয়ারফোর্থ তাকে সেখানেই কোথাও নিয়ে তুলেছে। ঠিকানা বের করাও হয়তো কঠিন হবে না। তার মায়ের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। তাঁর কাছ থেকেও হয়তো কোনো সাহায্য পেতে পারি।'

মিস্টার পেগটি শান্ত হলেন। হ্যাম ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলো। তাকেও আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো হ্যাম। আমার জীবন থাকতে তোমাদের বা এমিলির কোনো ক্ষতি হতে আমি দেবো না।'

* * *

পরদিন পেগটি ও মিস্টার পেগটিকে নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এলাম। প্রথমেই স্টিয়ারফোর্থ-এর মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। প্রথমে তো তিনি কিছু বিশ্বাস করতেই চান না। এমিলির চিঠি পড়ে ছেলের কাণ্ডকারখানায় খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন। অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে শেষে মিস্টার পেগটিকে বললেন, 'কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এ ব্যাপারে আপনারা যে লজ্জাকর অবস্থায় পড়েছেন, তার থেকে শতগুণ লজ্জা আর কলঙ্ক আমাদের পরিবারের উপর এসে পড়েছে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানোই দায় হয়ে উঠেছে। আমাদের বংশমর্যাদাও ধুলোয় লুটিয়েছে।'

আমি বললাম, 'স্টিয়ারফোর্থ কোথায়?'

তিনি বললেন, 'জানি না। তোমাদের সঙ্গে সেই দেখার পর থেকেই কোথায় যে উধাও হয়েছে! ভেবেছিলাম কোথাও বেড়াতে গিয়েছে হয়তো। এখন বুঝছি হতভাগা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।'

মিস্টার পেগটি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'কিন্তু আমার এমিলিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছু আঁচ করতে পারেন কি?'

তিনি বললেন, 'না।'

মিস্টার পেগটি অবুঝের মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন, 'মনে কিছু করবেন না মাদাম। এখন বুঝতে পারছি, আপনার ছেলে নিষ্পাপ এই সরল মেয়েটিকে ফাঁকা কথায় ভুলিয়ে বাড়ির বার করে এনেছে। যদি ওকে তার বিয়ে করারই মতলব থাকতো তবে সরাসরি তাকে আপনার কাছে না এনে, এভাবে লুকিয়ে বেড়ানোর মানে কি ?'

মিসেস্ স্টিয়ারফোর্থও একটু গরম হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমার মত চাইলেই কি সে তা পেতো ভেবেছেন ? জীবন থাকতে এ বিয়েতে আমি রাজী হতাম না জেনে রাখুন। আপনার ভাই-ঝিকে আপনি যতই ধোয়া তুলসীপাতা বলে মনে করুন না কেন, সে একেবারে ছেলেমানুষ নয়। আমাদের মা-ছেলের গভীর সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর ব্যাপারে তারও কি কোনো হাত নেই বলতে চান ? সে কি এতোই ন্যাকা ?'

মিস্ ডার্টল আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিলেন। ঘৃণায়, হিংসায় তাঁর মুখখানা হঠাৎ বীভৎস হয়ে উঠেছে দেখলাম। মিসেস্ স্টিয়ারফোর্থের কানে কানে কি যেন তিনি বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস্ স্টিয়ারফোর্থও জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কক্ষণো না। প্রথমেই সেই হতভাগাকে ঐ অলক্ষুণে মেয়েটার সংস্রব ছেড়ে মাথা নীচু করে এখানে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তবেই সে এ বাড়িতে ঢোকার অধিকার পাবে। নইলে যতো আদরেরই সে আমার হোক, এখানকার দরজা চিরদিনের মতো তার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে, মনে রেখো।'

আমি আর মিস্টার পেগটি চুপচাপ বেরিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ দরজার গোড়ায় পেছন থেকে চাপা গলায় কে ডাকলো। মুখ ফিরিয়ে দেখি মিস্ ডার্টল। ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিস্টার কপারফিল্ড। সেই হতচ্ছাড়িকে আমিই খুঁজে বের করবো। আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে স্টিয়ারফোর্থ কোথাও তাকে

লুকিয়ে রাখতে পারবে না। আমার পথের কাঁটা যে করে হোক সরাতে আমাকে হবেই। দরকার হলে সেই শয়তানীকে ছুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেও পিছপা হবো না।'

তাঁর সাংঘাতিক কথায় আ'ম চমকে উঠলাম। বললাম, 'না, না, ঈশ্বরের দোহাই, সে সব কিছু করবেন না। যে-কোনো ভাবে এমিলিকে খুঁজে পেলেই মিস্টার পেগটি হাতে স্বর্গ পাবেন। তার খোঁজ-খবর পেলেই দয়া করে আমাকে জানাবেন।'

বিদঘুটে গলায় তিনি জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে। স্টিয়ারফোর্থ-এর এ খেলা আমি ভাঙবোই। তার আর আমার মধ্যে কোনো তৃতীয় পক্ষের স্থান নেই।'

* * *

অত্যন্ত মানসিক অশান্তিতে দিন কাটতে লাগলো। আহার-নিদ্রা ভুলে বেচারা মিস্টার পেগটি পাগলের মতো কোথায় এমিলি, কোথায় এমিলি করে সারা লণ্ডন শহর চযে বেড়াতে লাগলেন। পেগটি আমার বাড়িতেই আছে। ইতিমধ্যে মিকাবর-পরিবারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। প্রায় ভাত জোটে না গোছের অবস্থা। আহা, এমন মানুষটার এই হাল! কিভাবে বেচারাকে একটু ধরে তোলা যায়, তাও ভাবছি। কিন্তু এ সবের চেয়েও আর একটি কঠিন সংকট যে আমার নিজের জন্যেও ওৎ পেতে ছিলো, কে জানতো?

একদিন বাড়ি ঢুকে ঠাকুরমার গলা পেলাম। পেগটির সঙ্গে যেন কথা কইছেন। ভারী আনন্দ হলো। কতদিন পর আবার তাঁকে দেখব। কিন্তু ঘরে ঢুকেই এক নিমেষে তা উবে গেল। ঠাকুরমার সেই হাসি-খুশি চেহারা আর নেই। মুখখানা মলিন, থমথমে। দেখি মেঝের উপর মস্ত বড় একটি বাঁধা-ছাঁদা বেডিং-এর উপর বসে তিনি চা খাচ্ছেন। পাশেই পেগটি দাঁড়িয়ে। বড় বড় ছুই ট্রাঙ্ক ও আরো টুকিটাকি জিনিসপত্র আশেপাশে ছড়ানো।

খাঁচা সমেত তাঁর প্রিয় ক্যানারী পাখিটিও সেখানে উপস্থিত। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবু হাসিমুখে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আরে, ঠাকুরমা যে। কখন এলে? কি খবর?'

চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে ছোট্ট করে আমার কপালে একটি চুমো দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি যা বললেন, শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। সব কথা ভেঙে তিনি বললেন না, তবু যেটুকু শুনলাম তাতেই বুঝতে পারলাম শুধু ডোভারের ঐ ছোট্ট বাড়িটুকু ছাড়া ঠাকুমা তাঁর যথাসর্বস্ব খুইয়েছেন। এক কপর্দকও আর তাঁর নেই। ডোভারের বাড়িটি জেনেট-এর জিম্মায় রেখে এসেছেন, দেখে-শুনে একটি ভাড়াটে বসাবার জন্য। ভাড়ার সেই সামান্য ক'টি টাকাই এখন থেকে তাঁর একমাত্র সম্বল। আর সম্পত্তির মধ্যে এই মেঝের উপর ছড়ানো জিনিস ক'টি।

আমার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না। তবু কোনোমতে বললাম, 'সে কি? কি করে এমনটা হলো?'

তিনি বললেন, 'সে অনেক কথা। তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। জানিস, বিপদেই মানুষের চরম পরীক্ষা। এতো দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা উৎরিয়েছি জীবনে, এটাও উৎরাবো। এর জন্য দুঃখ নেই। দুঃখ কেবল একটাই, তোর পড়াশোনার খরচ কি করে চালাবো!'

আমি বললাম, 'তা নিয়ে তুমি ভেবো না। আমিই যে করে হোক চালিয়ে নেবো। শুধু আশীর্বাদ করো যেন তোমার স্নেহের যোগ্য হতে পারি।'

কথাটা বলে ফেললাম বটে, কিন্তু কি করে তা হবে ভগবানই জানেন। রুজি-রোজগারের একটা ফিকির খুঁজতে হবে। কিন্তু চট করে তা পাচ্ছিই বা কোথায়? হঠাৎ মাথায় আর একটা ফন্দি এলো।

স্পেনলো সাহেবের ফার্মে সেদিন মাত্র ঢুকেছি। সেখান থেকে নাম কাটিয়ে যদি বেরিয়ে আ'স তবে ফি হিসেবে জমা সেই একশো পাউণ্ড কি ফেরত পাওয়া যায় না? এ দুঃসময়ে একশো পাউণ্ডও তো অনেক টাকা।

সারারাত এই চিন্তায়ই ছটফট করে কাটলো। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়লাম। অনেকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই চলেছি, হঠাৎ উল্টোদিক্ থেকে একখানা চলন্ত গাড়ি আমার পাশে এসে থামলো। মুখ তুলেই দেখি অ্যানিস। দরজা খুলে সে তার সুন্দর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। উদ্দেশ্য, হাত ধরে আমি তাকে নামাই। আমার তো তাতে আনন্দই। নেমেই সে বললো, 'চলো, হাঁটতে হাঁটতেই যাই! কোন্‌দিকে যাচ্ছ তুমি?'

আ ম বললাম, 'বিশেষ কোথাও নয়। তুমি?'

সে বললো, 'তোমার ওখানেই।'

আমি বললাম, 'কি সৌভাগ্য! কিন্তু কেন, হঠাৎ?'

তার মুখে শুনলাম, কালই সে লণ্ডনে এসেছে। একা নয়। বাবাও এসেছেন। আর এসেছে ঐ ইউ'রয়া হিপ। সে শুধু এখন তার বাবার কারবারের অংশীদারই নয়, তাঁর বাড়িরও একজন। খাওয়া-শোওয়া সব কিছুই সেখানে। আমার সেই পুরোনো ঘরখানা নাকি সে দখল করে বসেছে। শুধু সে-ই নয়, তার মা'ও সেখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ওদের দাপটে মনে হয় ওরাই যেন বাড়িওয়ালা, অ্যানিসরা ওদের ভাড়াটে।

শুনে, বিশেষ করে বলার সময় অ্যানিসের চোখ ছাপিয়ে জল পড়তে দেখে, রাগে দুঃখে মনটা বিষিয়ে উঠলো। ওকে সান্ত্বনা দেবার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না। শুধু বললাম, 'দুঃখ করো না লক্ষ্মীটি। অন্যায় কখনো বেশিদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।'

সে বললো, 'তোমার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমি লণ্ডনে এসেছি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাকে ঐ শয়তানটার কাছে একা ফেলে বেরিয়েছি। ডোভার থেকে তিনি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন যে, চিরদিনের মতো ডোভার ছেড়ে লণ্ডনে আসছেন তিনি। অতি অবশ্য যেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি।'

অ্যানিসকে দেখেই ঠাকুরমা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন: 'খবর সব ভালো তো ?'

অ্যানিস বললো, 'মোটামুটি, আপনার খবর কি তাই বলুন।'

ঠাকুরমা বললেন, 'চিঠিতেই সব লিখেছি। আমি একদম দেউলে হয়ে গেছি মা। অনেকদিন তোমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই। তাঁর কারবারের হালচালের খবরও ইদানীং রাখি না। শুনেছি তিনি অসুস্থ। নিজে বিশেষ কিছুই দেখেন না। নতুন অংশীদারের হাতেই নাকি সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন।'

অ্যানিস চুপ করে শুনছিলো। ভনিতা ছেড়ে ঠাকুরমা এবার সোজা কথায় এলেন। বললেন, 'ভুলটা অবশ্য আমারই। মিস্টার উইকফিল্ডকে আলাদা ভাবে কিছু না জানিয়েই টাকাটা খাটাতে চেয়েছিলাম আমি। কোম্পানিকে সেইভাবেই চিঠি লিখেছিলাম। এখন শুনছি গোটা টাকাটাই নাকি লোকসান হয়ে গিয়েছে। আরো বার কয়েক তো এরকম করেছি কিন্তু এমন তো কখনো হয়নি!'

অ্যানিসের মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হয়তো তার মনে হলো ঠাকুরমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার বাবাকেই এ ব্যাপারে কোনো-না-কোনো কারচুপির জন্যে সন্দেহ করছেন। ঠাকুরমাও হয়ত তার মনের ভাব আঁচ করেই হাসিমুখে তার হাতখানা ধরে মিষ্টি গলায় বললেন, 'তুমি কিছু মনে করো না মা। আমার ভাগ্য ছাড়া এর জন্য আর কাউকেই আমি দোষ দিচ্ছি না। তোমার বাবা আমার

অনেকদিনের বন্ধু। নিশ্চয়ই ভেতরে কোনো গণ্ডগোল আছে; তিনি জানেন না।'

আমার পড়াশোনা শিকেয় ওঠার খবরও ঠাকুরমা অ্যানিসকে দিলেন। উত্তরে সে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ ভালো কথা। এবিষয়ে তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি ডেভিড। তোমার ক্যান্টারবেরীর শিক্ষক ডক্টর স্ট্রং সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন বোধ হয় জানো। তাঁর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী চাই। বাবাকে বলছিলেন একটি ভালো লোক দেখে দিতে। তোমাকে পেলে তিনি লুফে নেবেন। আমার তো মনে হয় আপাততঃ—'

কথাটা অ্যানিস শেষ করার আগেই আমি আহ্লাদে নেচে উঠলাম। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, 'এটা সত্যি সুখবর অ্যানিস। কালই আমি তাঁর সাথে দেখা করবো।'

৫

ভাগ্য ভালো, স্ট্রং সাহেবের চাকরিটা আমার হলো। মাইনে খুব বেশি না হলেও আপাততঃ এই বা কম কি? কিন্তু ঠাকুরমা ও পেগটিকে নিয়ে লণ্ডনে থাকতে হলে এ আয়ে কুলোনো অসম্ভব। আমাকে আরো কিছু করতে হবে। শুনেছি অনেক বড় বড় লোক সংবাদপত্রের রিপোর্টার হিসেবে তাদের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। বন্ধু ট্রাডল্‌স্‌ও তাই করে। তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা কইলাম।

সে বললো, সর্টহ্যাণ্ড না জানলে সে কাজ পাওয়া যায় না। ও বিদ্যেটা বেশ কঠিন। শিখতে পারো কিনা দেখো।'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই পারবো।'

সকাল পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরোই, ফিরি রাত দশটায়।

আইন পড়ি, চাকরি করি, সর্টহ্যাণ্ডের ক্লাশ করি, আরো দশ জায়গায় ঘোরাফেরা করি। পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলেই মনে করি না। যে করেই হোক আয় বাড়াতেই হবে আমার। ডোরাকে পাবার জন্য যোগ্য করে তুলতেই হবে নিজেকে।

এর মধ্যে ট্রাডল্‌স্‌-এর হাত দিয়ে মিস্টার মিকাবরের এক চিঠি পেলাম। দেখা করতে লিখেছেন তিনি। বন্ধুকে নিয়েই গেলাম। শুনলাম ইউরিয়া হিপ-এর অধীনে তার খাস-কেরানির চাকরি নিয়ে সপরিবারে ক্যান্টারবেরী রওনা হচ্ছেন তিনি।

খাস-কেরানি? ইউরিয়া হিপ-এর? আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু এর বেশি আর কিছু তিনি ভাঙলেন না। বরং বারবার জোর গলায় এ কথাটাই বোঝাতে চাইলেন যে, তাঁর বর্তমান অবস্থায় হিপ-এর দয়ায় এ চাকরিটি পেয়ে তিনি হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর অবশ্য এতো কম মাইনেতে স্বামীকে ভিড়তে দেওয়ায় খুবই আপত্তি, কিন্তু তিনি যাবেনই। হিপ-এর দয়া ও বিবেচনার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কাজ দেখিয়ে খুশি করতে পারলে হিপ নাকি তাঁকে আঙুল ফুলিয়ে কলাগাছ বানিয়ে দেবে। দুজনের কেউ-ই আমরা আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম।

কয়েক মাসেই আমি সর্টহ্যাণ্ড পাশ করলাম। পার্লামেণ্ট-এর এক বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা সাংকেতিক প্রণালীতে দ্রুত লিখে ফেলে নিজের যোগ্যতার প্রমাণও দিলাম! তাঁর কথামতো রোজ কমন্স সভায় গিয়ে আরো অনেকের বক্তৃতাই ঐভাবে লিখে হাত রপ্ত করতে লাগলাম। ডোরার জন্যই আমি এতো পরিশ্রমের শক্তি পাচ্ছি। না হলে নিশ্চয়ই ভেঙে পড়তাম।

কিন্তু এর মধ্যে একদিন তার বাবা স্পেনলো সাহেব আমার সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহের উপর হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিলেন।

স্পষ্ট আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর মতো একজন অবস্থাপন্ন মানুষ আমার মতো চালচুলোহীন গরিবের হাতে মেয়ে দিতে পারেন না। তা ছাড়া, আরো বললেন যে ডোরাকে আমার ঘন ঘন চিঠি-পত্র লেখা বা দেখা-সাক্ষাৎও তিনি পছন্দ করেন না।

লজ্জায় দুঃখে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। ডোরাকে আর মুখ দেখাতে ইচ্ছে করছিল না, তবু সাত-পাঁচ ভেবে একদিন তার সাথে দেখা করলাম। দেখলাম সেও আমারই মতো মুষড়ে পড়েছে। কি করবে, কি বলবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এক সময় বেশ রাগের সঙ্গেই বলে ফেললো যে, এর পেছনে রয়েছে আমারই আত্মীয়া সেই মিস্ মার্ডস্টোন নামে মহিলাটি, যিনি অভিভাবিকার মুখোশে তার পাহারাদারনী সেজে বসে আছেন।

আমি বললাম, 'তাই নাকি ?'

সে বলল, 'না তো কি ? ঐ ছুঁচোমুখীই তো বাবাকে তোমার নামে নানা কথা লাগিয়ে কান ভাঙিয়েছে। চুরি করে নিয়ে তোমার চিঠিপত্রগুলো তাঁর হাতে দিয়েছে।'

এতোক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। সেই ছোটবেলা থেকেই এই ভদ্রমহিলা আমাকে বিষ-নজরে দেখে এসেছেন। আজও সেই ভাবেই সমানে পেছনে লেগে আছেন। কারণ কি ভগবান্ই জানেন।

নানা অশান্তিতে আপিসে বসেও কাজে মন দিতে পারছিলাম না। বারবার ডোরার সেই মলিন মুখখানাই মনে পড়ছিলো। পাছে ডোরাকে ওরা এ নিয়ে আরো কিছু বলে বা মনে আঘাত দেয় সেজন্য বেশ করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুন্দর করে মিস্টার স্পেনলোকে একখানা চিঠি লিখলাম। তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি আমাকে ভুল না বোঝেন এবং আমার কাজের জন্য ডোরার প্রতি বিরূপ না হন বা তাকে অকারণ কষ্ট না দেন।

চিঠিতে ফল ভালোই হলো। পরদিন ফার্ম থেকে বেরোনোর মুখে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, চিঠি পড়ে তিনি খুশিই হয়েছেন। এ নিয়ে ডোরার মনে তিলমাত্র ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। ডোরাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। তাকে তার যোগ্য পাত্রেই তিনি দেবেন। তার আগে এ ধরনের ছেলেমানুষি তিনি পছন্দ করেন না।

শুনে মন থেকে একটা পাষাণ-ভার নেমে গেলো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম, তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা?

পরদিন যথারীতি ফার্ম-এ গিয়ে নিজের জায়গাটিতে বসেছি। আপিসশুদ্ধ সবাই কেমন যেন নিঃসাড়, চুপচাপ। কেরানি, দপ্তরি সবাই উপস্থিত কিন্তু হাতগুটিয়ে বসে আছে, কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না। ব্যাপার কি? এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি, হঠাৎ একজন বলে উঠলো, 'কি শোচনীয় মৃত্যু!'

আমি বললাম, 'কার কথা বলছেন?'

তিনি বললেন, 'কেন, শোনেন নি আপনি? ভয়ানক এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। স্পেনলো সাহেব কাল মাঝরাতে মারা গেছেন।'

আমি বজ্রাহতের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেলাম। কি করে সম্ভব! এই তো কালই তাঁর সঙ্গে কথা কইলাম!

পর মুহূর্তেই ডোরার কথা মনে পড়লো। কি করে এই নিদারুণ শোক সে সহ্য করবে? আঃ, বেচারা!

যা হোক, মিস্টার স্পেনলোর শেষ কাজ সমাধা হয়ে গেলো; লণ্ডনের কাছেই 'পুটনি'তে তাঁর দূর-সম্পর্কের দুই বোন থাকতেন। তাঁরা ডোরাকে তাঁদের আশ্রয়ে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুর পর জানা গেল, স্পেনলো সাহেব নিজেকে যত বড় মানুষ বলে জাহির করতেন, আসলে তা নয়। বরং বেশ কিছু ধার-দেনা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই

তিনি রেখে যাননি। ডোরা কাঁদতে কাঁদতে লণ্ডন থেকে বিদায় নিলো।

৬

এখন আমি আর ছেলেমানুষটি নেই। দস্তুরমতো সাবালক। বিশিষ্ট একজন উকিল, পাকাপোক্ত রিপোর্টার এবং উদীয়মান সাহিত্যিক। পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়, নাম-যশও বেশ কিছুটা হয়েছে। নিজের জীবনের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে একখানা মস্ত উপন্যাসেও হাত দিয়েছি। ধারাবাহিক সেটি এক বিখ্যাত পত্রিকায় বেরোচ্ছে, মোটা অঙ্কের টাকাও পেয়েছি তার জন্যে। মোটামুটি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি।

আর একটি সুখবর, ডোরার সাথে আমার বিয়েও পাকাপাকি হতে চলেছে। একে দূর-সম্পর্কের পিসী, তাতে আবার স্পেনলো সাহেব টাকাকড়ি কিছুই রেখে যান নি, কতদিন আর ডোরাকে বসিয়ে খাওয়াবেন তাঁরা ? আমার নাম-যশ, আয়-টায় দেখে নিজেরাই তাঁরা এগিয়ে এলেন বিয়েটা সেরে ফেলতে। ট্রাডল্‌স্‌ও এর মধ্যে সোফিকে বিয়ে করেছে। বেশ সুখেই আছে দুটিতে।

আমার বিয়েতে তারাও এলো। দিব্যি হাসিখুশি মেয়ে সোফি। একাই প্রায় মাতিয়ে তুললো আসর। এলো আরো অনেক লোক, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিলো। খুব ধুমধামেই বিয়েটা হলো। ঠাকুরমার আর পেগটির আনন্দ দেখে কে! দুজনেই যেন রাতারাতি ছেলেমানুষ হয়ে গেল একেবারে। এমন জমকালো সাজপোশাকে ঠাকুরমাকে আর কোনোদিন দেখিনি। শাদা বনেট-বাঁধা শিল্কের গাউন, কেতাদুরস্ত টুপী, দামী জুতো পরে সকলকে নিয়ে

আমার সঙ্গে তিনি গির্জায় গেলেন। আলোয় আলো হয়ে গেল চারদিক, প্রার্থনার ঘণ্টা বাজলো, পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন। ফুরফুরে ফ্রিল-এর রঙীন পোশাক পরে, গন্ধ-ভুরভুর রাঙা ফুলের মতো মন-ভোলানো ডোরা স্বপ্নের রাজকন্যার মতো বধূবেশে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। স্বপ্নের মতোই সেই মধুর রাতটি আমাকে যেন এক অবাক্ আনন্দে বিভোর করে দিলো।

বিয়ের পরই লণ্ডনের ভদ্র পাড়ায় সুন্দর একটি ফ্ল্যাট নিয়ে আমরা সেখানে উঠে এলাম। ঠাকুরমা আমাদের দুটিকে নিরিবিলি রেখে পেগটিকে নিয়ে ডোভারে ফিরে গেলেন। আমাদের নতুন সুখের জীবন শুরু হলো।

কিন্তু ভগবান্ বোধহয় আমার কপালে স্বস্তি লেখেন নি। বিয়ের প্রথম কিছুদিন আনন্দের মশগুল নেশায় কাটলো। তারপর ক্রমেই বুঝতে পারলাম সংসারের কাজেকর্মে ডোরা একেবারেই আনাড়ি। না জানে রান্নাবাড়া, না পারে গোছ-গাছ, সব কিছুই এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হতে লাগলো। একটি চাকরানি ছিল, বাধ্য হয়ে আরো একটি রাখতে হলো। তাতেও বিশেষ সুরাহা হলো না। খরচ বাড়লো কিন্তু বিশৃঙ্খলা কমলো না। রান্না তো প্রায় হতোই না। না খেয়েই ছুটতে হতো কাজে, নয়তো উনোরটা ছুনো দিয়ে হোটেল থেকেই খেয়ে আসতে হতো। হিসেব নেই, পত্র নেই! রাখারও কেউ নেই। সে এক দুঃসহ অবস্থা!

ডোরার সাথে এই নিয়ে খিটিমিটি বাঁধতে লাগলো হামেশাই। কথা কাটাকাটি ও ঝগড়াঝাটিও যে অল্পসল্প হতো না তাও নয়। একটু পরেই যদিও আবার তা ভুলে গিয়ে দুজনে গলাগলি হয়ে বসতাম, তবু কোথায় যেন অসুবিধে ও অপ্রসন্নতার একটু কাঁটা গোপনে মনের মধ্যে খচ্‌খচ্ করতোই। ডোরা ভীষণ লজ্জা পেতো। তার নিজের দোষেই এসব ঘটছে ভেবে কোনো মন-কষাকষিই সে গায়ে

মাখতো না। প্রাণপণে চেষ্টা করতো আমাকে সুখী করতে, সব কিছু শিখে নিতে, কিন্তু বেচারা ছেলেবেলা থেকেই কিছু শেখেনি, পারে না, কিই-বা বলবো তাকে ?

এক একদিন একলা বসে বসে সে কাঁদতো। আমার কষ্ট বাড়ছে, যত্ন-আত্তি ঠিকমতো হচ্ছে না, শুধুই খরচা হচ্ছিল দিন দিন, কোনো-দিক দিয়েই সে কিছু করে উঠতে পারছে না, এই ভেবেই হয়তো সে কাঁদতো, কিন্তু মনের এই দুঃখ, দুশ্চিন্তা তার শরীরের উপরও প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত করতে লাগলো। দিনদিনই সে মনমরা হয়ে যেতে লাগলো। তার স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়তে লাগলো। নানা কাজকর্মের ধান্দায় প্রথমটা আমি বিশেষ লক্ষ্য করিনি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই যখন সে অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়লো তখন ডাক্তার-বদ্যি ডাকলাম। রোগ তখন বেশ শেকড় গেড়ে বসেছে শরীরে। রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। চিকিৎসা চলতে লাগলো, কিন্তু ফল হতে লাগলো সামান্যই। ক্রমে ডাক্তারও যেন হালে পানি পাচ্ছেন না বলে মনে হলো।

ডোরা একেবারেই বিছানা নিলো। আমি 'হায় হায়' করতে লাগলাম, এই আমার কপালে ছিলো ? প্রাণ দিয়ে যে ডোরাকে ভালোবাসি, যাকে নিয়ে জীবনে সবচেয়ে সুখী হবো ভেবেছিলাম সেই প্রিয়তমা ডোরাকে কি এমনি করেই নিষ্ঠুর ভাগ্য আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ? না, না, তা হতে পারে না। হতে দেবো না আমি। যেমন করে হোক ডোরাকে বাঁচাতেই হবে।

ট্রাডল্‌স্‌-এর পরামর্শে লণ্ডনের সবচেয়ে বড় ডাক্তারদের একজনকে নিয়ে এলাম। তাঁরই হাতে রাখলাম ওকে। কিন্তু অল্প-দিনেই তিনিও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। দিন দিনই কঙ্কালসার হয়ে পড়তে লাগলো ডোরা। দেখে-শুনে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগলো।

৭

মাস দুই পরে সন্ধ্যের পর বাড়ির সামনে ছোট্ট 'লন'টিতে পায়চারি করছি আর ডোরার কথাই ভাবছি, এমন সময়ে হঠাৎ মিস্টার পেগটি এসে উপস্থিত। খুশির উত্তেজনায় তিনি যেন হাঁপাচ্ছেন। নমস্কার করে বললেন, 'সুসংবাদ স্যার, আমার এমিলি বেঁচে আছে। ভগবানের দয়ায় তার ঠিকানা মিলেছে। এই দেখুন। লণ্ডনেই সে আছে।'

দুঃখের মধ্যেও আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম, 'তাই নাকি ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল শরীরটা ভালো ছিলো না, দিনমানে আর বেরোতে পারিনি। সন্ধ্যের পর বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লোক চলাচল দেখছি, হঠাৎ একটি মহিলা পাশ থেকে আমার হাতে এই কাগজটুকু গুঁজে দিয়েই ফুশ করে যেন হাওয়া হয়ে গেলেন। অন্ধকারে ভাল করে দেখতেও পেলাম না মহিলাটিকে।'

মহিলা !' হঠাৎ আমার মনে হলো মিস্ ডার্টল নয় তো ?

মিস্টার পেগটি আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। এবার হাত জোড় করে বললেন, 'একবারটি দয়া করে আপনাকে একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে যে স্যার !'

কাগজখানার দিকে ভাল করে চোখ বুলোলাম। হ্যাঁ, গোল্ডেন-গ্রীন-এর কাছাকাছি একটি ঠিকানাই বটে! তাতে লেখা আছে যে, আজ রাত্রেই মিস্টার পেগটি ও আমি যেন অতি অবশ্য সেখানে যাই।

ওদিক্‌টা লণ্ডনের গরিব পাড়া। যা হোক গ্রীন-এ গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। বাড়িটির বাইরের দরজা ভেজানো থাকলেও ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। পুরোনো, নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি ; অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে মনে হলো একটি মেয়েছেলে যেন আগে থেকেই সিঁড়ির দু'এক ধাপ উপরে চুপটি করে

দাঁড়িয়ে ছিলো। আমরা ঢুকতেই সেও আমাদের আগে আগে চলতে লাগলো। চলার ঢঙটি যেন চেনা-চেনা, অথচ মুখখানা ঠিক নজরে আসছে না।

দোতলায় উঠেই সামনের ঘরের দোর খুলে ভেতরে ঢুকলো। এক ঝলক আলো মুহূর্তের জন্য তার মুখের উপর এসে পড়লো। এক আশ্চর্য ! যা অনুমান করেছিলাম, তাই। মিস্ ডার্টল্‌ই বটে !

ঘরে ঢুকেই অস্ফুট গলায় তিনি স্টিয়ারফোর্থ-এর নাম ধরে ডাকলেন। ঘরখানা আমরা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু একপাশের একটি খাটের এক চিলতে মাত্র চোখে পড়ে। খাটের ওপাশ থেকে কে যেন মৃদু কণ্ঠে বললো, 'কে ? তিনি তো বাড়ি নেই।'

মৃদু হলেও সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা শরীরে একটি আনন্দের শিহরণ বয়ে গেলো। এ গলা এমিলির।

উত্তরে কর্কশ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মিস্ ডার্টল, 'ন্যাকামি করো না। এতোদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজে তবে ওর ঠিকানা পেয়েছি আমি। কোথায় লুকিয়ে রেখেছো তাকে, ভালো চাও তো শিগগীর বের করে দাও।'

আবার সেই মৃদুকণ্ঠ : 'সত্যি বলছি তিনি এখানে নেই। প্রায় এক মাসের উপর থেকেই নেই। কোথায় আছেন, তাও আমি জানি না।'

তেমনি ঝাঁঝালো গলায় মিস্ ডার্টল্ বললেন, 'চুলোয় যাক সে, তার দরকার নেই। তুমি তো মরোনি, তুমি সামনে এসো। তোমাকেই আমরা চাই, মানে সেই কুলে-কালি-দেওয়া নচ্ছার মেয়েটাকে—যে স্টিয়ারফোর্থকে জাদু করে এই নরকে এনে তুলেছে।'

এবার মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, এমিলিই বটে ! কিন্তু এই কি সেই এমিলি ? সেই প্রফুল্ল প্রজাপতির মতো সুন্দর প্রাণ-চঞ্চল মেয়েটি ? তার বদলে এ কাকে দেখছি ? চোখের কোণে কালি ভাঙা, মুখখানা শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে যাওয়া, দুঃখ-দুর্দশার

জীবন্ত প্রতিমূর্তির মতো ধীরে ধীরে এ কে মিস্ ডার্টল্-এর দিকে এগিয়ে আসছে? মনে হলো যেন তার পা কাঁপছে, আমাদের সে তখনো দেখতে পায়নি।

মিস্ ডার্টল্ ধমকে উঠলেন, 'ব্যস, আর এগিও না। তোমার ঐ নোংরা শরীরের ছায়াও যেন আমার গায়ে না লাগে। শোনো, এই নরকে বসে কোনোদিন কি একটি বাড়ির কথা তোমার মনে হয়েছে—যেখানকার সমস্ত সুখ-শান্তি, মান-সম্মান তুমি ধুলোয় লুটিয়েছ?'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো এমিলি—'বাড়ি? ছেড়ে আসার পর থেকেই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত আমি চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে বাড়িখানির কথা ভেবেছি। উঃ! কে নিয়ে যাবে আমাকে সেখানে?'

আবার দ্বিগুণ বেগে গর্জে উঠলেন মিস্ ডার্টল্—'জাহান্নামে যাক তোমার সেই কুঁড়েঘরের আঁস্তাকুড়। সে বাড়ির কথা বলছি না আমি; বলছি স্টিয়ারফোর্থ-এর বাড়ির কথা, যেখানে আমি আর সে পরমসুখে থাকতাম। তোমার মতো হাভাতের বাচ্চারা যেখানে চাকরানী হয়েও ঢুকতে পারে না। সে বাড়ির চরম সর্বনাশ তুমি করেছো, আমারও সুখ-শান্তি জন্মের মতো কেড়ে নিয়েছো। তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।' বলেই চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি এমিলির গালে মস্ত একখানা চড় কষাতে গেলেন, কিন্তু ভাগ্য ভালো, হাত ফসকে সেটি তার মুখে লাগলো না।

মিস্টার পেগটি অনেকক্ষণ থেকে রাগে ফুঁসছিলেন, এবার মিস্ ডার্টল্‌কে এক হাত নেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আগেই আমি দুজনার মাঝখানে গিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই এমিলিও আমাদের চিনতে পেরে ডুকরে কেঁদে উঠে 'কাকা-মনি' বলে মিস্টার পেগটির বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পেগটিও তৎক্ষণাৎ 'হা ঈশ্বর!' বলে তাকে পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিয়ে বাইরে নেমে এলেন।

আমাকে বললেন, 'চলে আসুন স্যার। আমার হারানিধি আমি ফিরে পেয়েছি। আর একমুহূর্তও এখানে নয়।'

বাড়ি এসে সুস্থ হয়ে উঠতে এমিলির বেশ কয়েকদিন লাগলো। তারপর তার নিজের মুখেই স্টিয়ারফোর্থের সাথে তার পালিয়ে আসার কাহিনী শুনলাম। সে কাহিনী খুবই করুণ! সে তাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদায় নিজের বাড়িতে নিয়ে তুলবে কথা দিয়েছিলো। মিস্টার কপারফিল্ডের বন্ধু হিসেবে বিনা দ্বিধায় সে তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভুল যখন ভাঙলো তখন আর ফেরবার উপায় নেই। কিছুদিন একসঙ্গে থেকে হঠাৎ একদিন তাকে এভাবে ফেলে রেখে কোথায় যে সরে পড়লো তা এমিলি জানতেই পারেনি। পাশের ঘরের প্রতিবেশী একটি গরিব মেয়ের সাহায্য না পেলে এখানে তাকে না খেয়েই মরতে হতো। সেই মেয়েটির মুখেই শুনেছে যে, স্টিয়ারফোর্থ নাকি জাহাজে চাকরি নিয়ে বাইরে কোথায় গিয়েছে। সেই জাহাজ ফিরতি খেপে লণ্ডন বা ইয়ার-মাউথে ভিড়লেই সে নাকি এমিলিকে তাতে তুলে নিয়ে দূর বিদেশে কোথাও গিয়ে থাকবে।

মিস্টার পেগটি উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শুনুন স্যার, আমরা গরিব বলেই কি সে এভাবে আমার ভাইঝির মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস পেল ? না, কক্ষণো তা হতে পারে না। সেই ভদ্রবেশী শয়তানের ছায়া যাতে এমিলি আর এ জীবনে মাড়াতে না পারে তার জন্য এ দেশেই আর আমরা থাকবো না। সবাইকে নিয়ে বহুদূরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবো। শুনেছি সেটি নাকি একটি চমৎকার দেশ। খেটে-খাওয়া মানুষদের পক্ষে স্বর্গরাজ্য। সেখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করবো আমরা।'

হলোও তাই।

মাসখানেকের মধ্যেই এমিলিকে নিয়ে মিস্টার পেগটি সপরিবারে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিলেন।

হ্যাম-এর অবস্থাই হলো সবচেয়ে করুণ। এতো কাণ্ডের পরও এমিলির প্রতি তার ভালোবাসা একতিলও শিথিল হয়নি। সে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে চায়। কিন্তু এমিলি তাতে একেবারেই নারাজ। সে বারবার বলতে লাগলো, 'না, আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই। আমাকে ভুলে গিয়ে কোনো একটি সুন্দর, পবিত্র মেয়েকে বিয়ে করে জীবনে সুখী হও।'

মনের দুঃখে হ্যাম যেন কেমন হয়ে গেলো। মিস্টার পেগটির হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া না গিয়ে সে তার প্রিয়তম এমিলির স্মৃতিজড়ানো সেই ইয়ার-মাউথেই থেকে গেলো। জেলেদের নৌকোয় নৌকোয় উদয়াস্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে আর মাঝ-রাত অবধি উদ্‌ভ্রান্তের মতো একা একা সমুদ্রতীরে ঘুরে ঘুরে তার দিন কাটতে লাগলো।

ভাই চিরদিনের মতো দূর দেশে চলে যাচ্ছে, পেগটি খুবই মনমরা। আমিও তাকে বোঝাচ্ছি, আমিও তো এখন আর তোমার ছোট্ট ডেভিডটি নেই, আমার যত কষ্টই হোক ভাইয়ের সঙ্গেই তোমার যাওয়া উচিত। সে কিছুতেই শোনে না। বলে, 'না, না, তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাবো না। পেটে ধরিনি বটে, কিন্তু তুমিই আমার ছেলে। ছেলের চেয়েও বেশি, সেই কতদিনের বুকে করে মানুষ করা ধন, আমার ডেভি-সোনা।'

কথা শুনে চোখে জল আসে। আর কিছু বলতে পারি না, শুধু মাথাটি তার বুকের উপর রেখে মিষ্টি করে বলি, 'মা-মনি, আমার মা-মনি।'

এমিলির বিদায়-দৃশ্যটিই সবচেয়ে মর্মান্তিক। ইয়ার-মাউথের সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়ানো, পরীর মতো সেই ছোট্ট মেয়েটি, আমার ছেলেবেলার প্রথম সঙ্গিনী, সুহাসিনী—এমিলি। আর কোনোদিন তাকে দেখতে পাবো না। হ্যাম-এর দুঃখ একরকম, আমার

ব্যথা আর একরকম, তবু দুজনের বেদনায় কোথায় যেন একটা মিল আছে। হ্যামের মতো আমারও জীবনে যেন কি এক শূন্যতা নেমে এলো।

জাহাজ ছেড়ে দিলেও বহুক্ষণ উদাস চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, দেখলাম ডেকের উপর মিস্টার পেগটি মিস্ গামিজ আর এমিলিকে দুপাশে নিয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছেন। বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মুচছেন। ক্রমে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো। জাহাজ ধীরে ধীরে দূর সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে গেল। আর তাদের দেখা গেল না।

৮

এদিকে ইউরিয়া হিপ ঘুণ-পোকার মতোই তলে তলে উইকফিল্ড সাহেবের কারবার ঝাঁঝরা করে চলেছে। কারবারটির নাম যদিও 'উইকফিল্ড অ্যাণ্ড হিপ', আসলে কিন্তু হিপই এখন সর্বেসর্বা হয়ে বসেছে। উইকফিল্ড নামেমাত্র আছেন। মালিকের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে হিপ আগেই তাঁকে দিয়ে এমন কতকগুলো ভুয়ো জিনিস সই করিয়ে নিয়েছিলো, যা পরে জানতে পেরেও উইকফিল্ড সাহেবের আর শুধরে নেবার উপায় ছিলো না। অথচ সেগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লে বাজারে বদনাম তো বটেই, আইনের চোখেও তাঁর অপরাধী না হয়ে নিস্তার ছিলো না।

এইভাবেই বিনা দোষে তিনি একেবারে হিপ-এর হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে হিপও ক্রমে ক্রমে আরো অনেকদূর এগিয়েছে। উইকফিল্ড-এর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে এক স্বীকার-পত্র। তাতে কারবারের দেখাশোনা

হিসেব ও খরচপত্র রাখা এবং কর্তাগিরির সব ক্ষমতা উইকফিল্ড যেন নিজের ইচ্ছায় হিপ-এর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, এরকম লেখা ছিলো। সেখানা বাগিয়ে নিয়ে সে এবার আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলো। উইকফিল্ডকে পথে বসিয়ে তার কারবার ও সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে এবং তারপর অ্যানিসকে বিয়ে করে নিজে রাজা হয়ে বসবার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠলো। এর জন্য চুরি, জালিয়াতি, প্রতারণা কিছুতেই সে পিছপা ছিলো না। উইকফিল্ডের সই জাল করে এর মধ্যেই ফার্ম-এর অনেক গচ্ছিত টাকা সে আত্মসাৎ করেছিলো। জাল হিসেবপত্র তৈরি করে দেখানো হয়েছিলো যেন উইকফিল্ড তাঁর নিজের বা ফার্মের কোনো দেনা শোধের জন্যই সে টাকা খরচ করেছেন।

কিন্তু এসব কাজ একা হয় না। নিখুঁতভাবে এতোদিনের একটি কারবারের খাতাপত্র জাল করতে হলে বেশ পাকাপোক্ত একজন ওস্তাদ সাকরেদ চাই। কিছুদিন থেকেই সে মনোমত একটি লোক খুঁজছিলো যে আপিসের কাজেও যেমন করিৎকর্মা হবে তেমনি এ সব ব্যাপারেও হবে সমান পটু, বিশ্বস্ত ও অনুগত। ঘুণাক্ষরেও একটি কথাও যে ফাঁস করবে না কখনো, যে খাবে কম অথচ দুধ দেবে বেশি, অথচ বিপদে পড়লে যার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজে গলা বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

অনেক ভেবে-চিন্তে মিকাবরকেই সে কাজের উপযুক্ত বলে মনে করেছিলো। লোকটি বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর। লেখাপড়ার কাজেও ভালো। তার ওপর দেনার দায়ে জেল-টেল খেটে ফতুর হয়ে ইদানীং প্রায় ভিখিরির পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। সামান্য কিছু মাইনে আর চুরির টাকার ছিটেফোঁটা বখরা দিলেই লোকটা যে পোষা কুকুরের মতো তার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে এ বিষয়ে হিপ-এর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না। জাল-জুয়াচুরির সব কাজগুলো তাকে দিয়ে এই

ভাবে করিয়ে নিয়ে উপরে বসে ফোঁপর-দালালি করে নিজে মজা লুটবেন, এই ছিলো তার আশা।

কিন্তু মিকাবরকে চাকরি দেওয়াই তার কাল হলো। মিকাবর ছিলেন অত্যন্ত সৎ চরিত্রের মানুষ। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট তিনি পেয়েছেন, কিন্তু কখনো চরিত্র হারান নি। প্রথম দু'চারদিন তিনি হিপ-এর ফন্দি-ফিকির ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যেদিন থেকে পারলেন, সেদিন থেকেই বোকা সাজার ভান করে, হিপ-এর প্রতি কথায় ও কাজে সায় দিয়ে তার খুব বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। তার পর অতি কৌশলে একটি একটি করে তার মৃত্যু-বাণ নিজের তূণে এনে জমা করতে লাগলেন।

প্রথমেই ঝানু-উকিল মিস্টার ট্রাডল্‌স্-এর কাছে সব কিছু বলে তার পরামর্শ মতো কাজ করতে লাগলেন। মিস্টার উইকফিল্ডকে নিয়ে ট্রাডল্‌স্-এর নামে একখানা আমমোক্তার-নামাও এইভাবে লিখিয়ে নিলেন যে, কারবারের অংশীদার হিসেবে হিপকে আর তিনি ঠিক আগের মতো বিশ্বাস করতে পারছেন না বলে কারবারের স্বার্থে তিনি নিজেই দেখাশোনা করার অধিকার এখন থেকে তার উপরেই তুলে দিচ্ছেন।

এইভাবে চারদিকে আঁট-ঘাট বেঁধে মিকাবর গোপনে হিপ-এর চুরি-জোচ্চুরির সব মোক্ষম প্রমাণ সংগ্রহ করে ট্রাডল্‌স্-এর কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। এইভাবেই হিপ-এর সর্বনাশের পথ পাকা হতে লাগলো। হিপ তার বিন্দুবিসর্গও টের পেলো না।

তারপর একদিন বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই হিপকে তার আপিসে আমরা ঘেরাও করলাম। আমার, ঠাকুরমার, ট্রাডল্‌স্-এর উইকফিল্ড-এর এবং মিস্টার ডিক্সন নামে আর একজন বিশি উকিলের সামনে মিকাবর সেখানে হিপ-এর সমস্ত কুকীর্তি ফাঁস করে দিলেন। তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ

বে-আইনীভাবে 'উইকফিল্ড অ্যাণ্ড হিপ' কোম্পানির সমস্ত কর্তৃত্ব একা আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হলো।

হিপ প্রথমে খুব হম্বি-তম্বি দেখালেও এবং ট্রাডলস্‌কে একদম আমল না দিলেও উইকফিল্ডের আমমোক্তার-নামা ও মিকবারের অকাট্য সব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে শেষে গায়ে নুন পড়া জোঁকের মতো চুপসে এতোটুকু হয়ে গেলো। তার বাড়ি তল্লাশি করে অনেক টাকা বের করা হলো। অপিসের সিন্দুকেও তার লুকোনো কিছু টাকা ছিলো, তা বাজেয়াপ্ত করা হলো। নিজের অপরাধ স্বীকার করে হিপকে দিয়ে একটি কবুলতনামাও লিখিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তার বিশ বছরের জেল হয়ে গেলো।

উইকফিল্ড কারবার গুটিয়ে নিলেন। নিজের ছোট্ট একটি পুরোনো বাড়ি ছাড়া আর সব সম্পত্তি বিক্রি করে এবং হিপ-এর কাছে যা পাওয়া গিয়েছিলো সেই টাকায় আমার ঠাকুরমা সমেত আর আর সব পাওনাদারের দাবি-দাওয়া যথাসম্ভব মিটিয়ে দেওয়া হলো। যারা তাদের টাকা-পয়সা তছরুপের জন্য মনে মনে উইকফিল্ডকেই দায়ী করেছিলেন তাঁরা এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। উইকফিল্ড তাঁর পূর্বের সুনাম ও সম্মান বজায় রাখতে পারলেও দেনা মেটাতে একেবারে ফতুর হয়ে গেলেন।

অ্যানিস সে অবস্থায়ও দমলো না! সেই পুরোনো বাড়ির একতলাটি একটি গানের ইস্কুলকে ভাড়া দিয়ে সেই সামান্য টাকায়ই বাবাকে নিয়ে দোতলায় থেকে পাকা গিন্নির মতো খুব হিসেব করে সংসার চালাতে লাগলো।

অভাব-অনটনের মধ্যেও বিরাট এক দুশ্চিন্তা ও হিপের রাক্ষুসে কবল থেকে মুক্ত হয়ে অনেকদিন পর উইকফিল্ড-পরিবার শান্তি ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

মিকাবর আবার বেকার হয়ে পড়লেন। অনেকদিন থেকেই তিনি ভাগ্য বদলানোর জন্য কোনো দূরদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কি নিয়ে যাবেন ? ভেবেছিলেন হিপ-এর চাকরিতে লেগে থাকতে পারলে খেয়ে না খেয়ে তিনি কিছু টাকা জমাবেন, পরে তাই নিয়ে যেখানে হোক পাড়ি দেবেন, কিন্তু হলো না। প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় হিপ ধরা পড়েছে এবং পাওনাদাররা তাদের টাকা-কড়ি ফেরত পেয়েছে বলে সবাই মিকাবরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। বিশেষ করে আমার ঠাকুরমা। তিনিই সকলের আগে বেচারার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। সবাইকে বলে-কয়ে তাঁকে কিছু মূলধন জোগাড় করে দিলেন। নিজেও তিনি বেশ মোটা কিছু দিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার দু'হাজার পাউণ্ড হলো। কিন্তু মিকাবর সে টাকা দান হিসেবে নিতে রাজী হলেন না। ধার হিসেবে রীতিমতো হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে তবে তিনি তা নিলেন। কোথায় যাবেন, কোথায় যাবেন, করতে করতে অবশেষে সেই সম্বল হাতে তিনিও তাঁর সংসার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায়ই চলে গেলেন। এবার দুঃখের রাত্রি ভোর হয়ে তাঁর জীবনে নতুন সুখের দিন আসবে এই কামনা নিয়ে আমরা তাঁকে জাহাজে তুলে দিয়ে ব্যথাভরা প্রাণে বাড়ি ফিরে এলাম।

৯

পেগটিরা চলে গেছে। মিকাবর-পরিবারের সাথে বহুদিনের পরিচয়, তারাও বহুদূরে চলে গেলো। নানা কারণে মন বিষণ্ণ। তার ওপর অর্থ রোজগারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম। ডোরার দিকে তেমন নজর দিতে পারিনি। তার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছিলো। একদিন সে একেবারেই শয্যা নিলো। তখনো বুঝতে পারিনি তার জীবন-দীপ

ধীরে ধীরে নিভে আসছে, ভাবছি ডাক্তার তাকে নিশ্চয়ই সারিয়ে তুলবে। একটু ভাল হলেই ওকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাবো। আবার তাকে নিয়ে আমার সুখ-নীড়ে আনন্দে থাকবো। কিন্তু বিধাতা বোধ হয় আমার আশার পানে চেয়ে মুচকি হাসলেন। ভালোর দিকে যাওয়া তো দূরের কথা, ইদানীং ডোরা আর বিছানা থেকে উঠতেই পারে না।

কাজকর্ম ভুলে আমি তার পাশে বসে থাকি; সেবা-যত্নে, আদরে-সোহাগে, কথায়-বার্তায় ওকে যতটা পারি, হাসিখুশি রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু ডোরার মুখে বিষাদের বিবর্ণ ছায়া ক্রমেই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে।

মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে সে কাঁদে। কাতর ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'আমাকে বিয়ে করে কত কষ্টই না পেলে। কত অল্পবয়সেই আমি তোমার বালিকা-বধূ হয়ে এলাম! তোমার বয়সটাই বা কি? তুমিও সংসারের কিছু জানো না, আমিও না। কত বোকা ছিলাম, অবুঝ ছিলাম, কিছুই জানতাম না, কিছুই পারতাম না। তবু একটি কথা শুনে রাখো, আর কিছু পারি-না-পারি, তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিলাম। আজ বুঝতে পারছি তা সত্ত্বেও তোমার স্ত্রী হবার যোগ্যতা আমার ছিলো না। আজও নেই।'

আমি হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরি, 'না, না ডোরা, অমন কথা তুমি বলো না। কিছু করতে হবে না তোমাকে, কিছু পারতে হবে না, কিছুই চাই না আমি তোমার কাছে, শুধু তুমি আমার বুক জুড়িয়ে বেঁচে থাকো।'

দুচোখের কোণে দু'ফোটা জল নিয়ে সে ম্লান হাসে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলে, 'অ্যানিসকে একট আমার কাছে ডেকে আনতে পারো?'

আমি প্রশ্ন করি, 'কেন বল তো?'

সে বলে, 'বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে তাকে। কেন জানি না, আমার কেবলই যেন মনে হচ্ছে সময় নেই, আর সময় নেই।'

আমি আঁতকে উঠি। এ কি বলছে ডোরা? এত শীগগির তার সব শেষ হয়ে যাবে?

আমাকে কাঁদতে দেখে সে তার রোগা হাত দুটি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে: 'না, অমন করে কেঁদো না তুমি, লক্ষ্মীটি! আমি সইতে পারি না। অ্যানিসকে একটু খবর দাও। একা, নিরিবিলিতে তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

সঙ্গে সঙ্গেই অ্যানিসকে খবর পাঠালাম। পরদিন সে এসে পড়লো। তাকে ডোরার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আমি নীচের তলার বৈঠকখানায় এসে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলাম।

ডোরার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো। নার্স সেবা করছিলো। মাঝে মাঝে উপরে গিয়ে আমি দেখাশোনা করছিলাম। এর মধ্যে বার দুই ডাক্তার এলেন। ওষুধ বদলে, নার্সকে কি সব বলে চলে গেলেন।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। রাত ন'টায় আবার ডাক্তার এলেন। আমার মুখ-চোখের অবস্থা দেখে চিন্তিতভাবে বললেন, 'রোগিণী কেমন আছেন এখন?'

আমি বললাম, 'ভালো না। ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়ছে যেন। কথা কইতেও কষ্ট হচ্ছে।'

গম্ভীর মুখে একটি 'হু' বলে নিঃশব্দে তিনি উপরে উঠে গেলেন। অনেকক্ষণ পরে ঠিক সেইভাবেই নীচে নেমে এলেন। আমি হতাশ মুখে তাঁর মুখের দিকে চাইতেই বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'হার্ট-এর অবস্থা ভাল নয়, যে-কোনো সময়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোনো ওষুধেই আর কাজ করছে না। আমার যা করবার আমি করেছি, এখন ভগবানের হাত!'

আমি নিথর হয়ে গেলাম। খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে আমার

কানের কাছে মুখ এনে তিনি বললেন, 'জানি না ওপর-আলার কি ইচ্ছে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি মিস্টার কপারফিল্ড, যে-কোনো মুহূর্তে চরম অঘটনের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

আমি বোধহয় পাথর হয়ে গিয়েছিলাম, নইলে এ কথা শুনেও আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম কেন ?

মনের ভেতর প্রলয়ের ঝড় নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমি ছটফট করতে লাগলাম। একটু পরেই অ্যানিসের আকুল চিৎকার আমার কানে এলো, 'শীগগির ওপরে এসো ডেভিড, শীগগির !'

উন্মাদের মতো সিঁড়ি টপকে উপরে উঠেই দেখি, ডোরার সারা শরীর অসাড়, বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, মুখখানা কাগজের মতো শাদা, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে ; শুধু ঠোঁট দুখানি তখনও একটু একটু কাঁপছে ; যেন কিছু বলতে চায়। টলতে টলতে আমি তার মাথার কাছে বসে পড়লাম। মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনতেই অতিকষ্টে সে বললো, 'বিদায় ডেভিড, চিরদিনের মতো বিদায়। আমাকে বিদায় চুমো দাও প্রিয়তম। অনেক কষ্ট তোমাকে দিয়েছি, ক্ষমা করো, বলো, কোনোদিন তোমার এই বালিকা-বধূটিকে তুমি ভুলে যাবে না !'

পাগলের মতো 'না, না', বলে আমি চিৎকার করে উঠলাম। বুক-চাপড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'ডোরা, ডোরা, আমার বুক-জুড়োনো ডোরা, তুমিও আমাকে ছেড়ে চললে ? কি নিয়ে আমি পৃথিবীতে থাকবো ?'

নিভন্ত দীপশিখা অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে যেমন দপ্‌ করে একবার জ্বলে ওঠে, ডোরার নিঃসাড় বিবর্ণ চোখ দুটিও যেন তেমনি করে এক অন্তিম হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অ্যানিসের দিকে সেই চোখ দুটি তুলে সে বললো, 'অ্যানিস, বোন, আমার শেষ অনুরোধ মনে রেখো। আমার অসহায় ডেভি'কে একটু দেখো।'

এই-ই তার শেষ কথা। তারপরই তার কণ্ঠ চিরদিনের মত

নীরব হয়ে গেলো। বুঝলাম সব শেষ। প্রচণ্ড আর্ত চীৎকারে 'ডোরা, ডোরা' বলে আমি তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লাম।

ডোরা তখন বহুদূরে স্বর্গ-মর্ত্যের সীমারেখা ছাড়িয়ে কোন্ অজানা লোকে চলে গিয়েছে কে জানে?

১০

কিছুদিন পাগলের মতো কাটলো। কাজকর্ম বন্ধ। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, কিছুই ভালো লাগে না, দিনরাত কেবল ডোরার কথা ভাবি আর চোখের জল ফেলি।

বিয়ের পর ঠাকুরমা আমাকে নতুন বাড়িতে তুলে দিয়ে, পাওনা টাকা-পয়সা ফেরৎ পেয়ে সেই যে ডোভারে চলে গিয়েছিলেন, আর এ মুখো হননি। হয়তো ডোরার অবস্থার কথা শুনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ও আর বাঁচবে না! সেই বিয়োগান্ত দৃশ্য তিনি সইতে পারবেন না বলেই চিঠিপত্রে আকুলি-বিকুলি জানানো এবং আমাকে শক্ত হতে উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কিছু তিনি করেননি। এবার ডোরার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমাকে তিনি তাঁর মনের সমস্ত স্নেহ-মমতা ঢেলে অতিসুন্দর একখানা চিঠি লিখলেন। জানালেন, মনের এ অবস্থায় অযথা লণ্ডনে বসে এভাবে কাঁদাকাটা না করে কিছুদিনের জন্য আমি যেন বাইরে বেড়িয়ে আসি। ইউরোপের নানা ভালো ভালো জায়গাগুলোতে কিছুদিন ঘুরে বেড়ালে মনে অনেকটা শান্তি আসবে। এজন্য কিছু টাকাও তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু কোথায় যাই, কি করি কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলাম না। একবার ভাবলাম ডোভারেই চলে যাই। শেষ পর্যন্ত সুইজারল্যাণ্ডেই প্রথম যাওয়া স্থির করলাম। কিন্তু তার আগে

পেগটিদের ও এমিলির স্মৃতি জড়ানো ইয়ার-মাউথটি একবার দেখে আসার সাধ হলো। এমিলিকে হারিয়ে সেখানে হ্যাম বেচারাও একলা চোখের জলে ভাসছে। তার অবস্থাও আমারই মতো। হয়তো উন্মাদের মতো একা একা ঘুরছে। কি করছে, কেমন আছে কে জানে? হাতের গোড়ায় ইয়ার-মাউথ। দূরে পাড়ি দেওয়ার আগে সেখানেই বরং একবার যাই।

মোট-ঘাট বেঁধে রওনা হলাম। এবারও দুর্যোগ আমার পথের সাথী। সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সে এক ভয়ঙ্কর সন্ধ্যা। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। থেকে থেকে দমকা বাতাস উঠছে। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। গাড়োয়ান মোটা ওভার কোটে নাক-কান মুড়ি দিয়ে কোনোমতে গাড়ি চালাচ্ছে। হাওয়ার প্রচণ্ড বেগে এক এক সময় মনে হচ্ছে গাড়ি সমেত এই বুঝি আমরা উল্টে পড়বো! কেন জানি না, গাড়িতে বসে কি যেন একটা অমঙ্গলের আশংকায় আমার বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো!

কোনোমতে পুরোনো সরাইখানাটিতে এসে আশ্রয় নিলাম। এখানে স্টিয়ারফোর্থ আর আমি অনেকবার এসে থেকেছি। সেটিও সমুদ্রের কাছেই। বাতাস এবং সাগরের গর্জন ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে লাগলো। এক এক সময় মনে হতে লাগলো গোটা সরাইখানাটিই বুঝি এক ঝট্‌কায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। খানিকপরেই আরম্ভ হলো ভীষণ বৃষ্টি। এখানে বসেই শুনতে পাচ্ছি অনেক সোরগোল ও মেয়েলি কান্নার আওয়াজ। যে সব জেলেরা নৌকো নিয়ে এ দুর্যোগে মাছ ধরতে বেরিয়েছে, এখনো ফিরে আসেনি, তাদের আপনজনেরা কূলে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। আহা বেচারারা! আমারও মনটা যেন তাদের সাথে কেঁদে উঠলো। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন।

শুয়ে বসে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। কি করা যায় তাও বুঝতে পারছি না। আকাশ কালি-লেপা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কড় কড় করে বাজ পড়ছে। অন্ধকারে দুহাত দূরের জিনিস দেখা যায় না। একবার ভাবলাম শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম নামছে না চোখের পাতায়। জবুথবু হয়ে কোনোমতে ঘরের কোণে জানালাটির গোড়ায় বসে রইলাম।

এইভাবেই ভোর হয়ে গেলো। বোধহয় চোখে একটু তন্দ্রার ছোঁয়া লেগেছিলো। প্রচণ্ড এক সোরগোলে তা ভেঙে গেলো। চেয়ে দেখি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। প্রায় সারা ইয়ার-মাউথ সমুদ্রের কূলে এসে ভেঙে পড়েছে। গিসগিস করছে মানুষ। কেউ কাঁদছে, কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ কেউ দিশেহারার মতো ছুটোছুটি করছে। বৃষ্টিটা একটু কমেছে বটে, কিন্তু ঝড়ের বেগ সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েছে। সমুদ্র লণ্ডভণ্ড করে ক্ষ্যাপা দানবের মতো শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসছে বাতাস। বিরাট বিরাট ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে বুক-কাঁপানো শব্দে পারের উপর এসে আছড়ে পড়ছে। কারো সাধ্য নেই সে দিকে এগোয়।

এরই মধ্যে চোখে পড়ছে আর একটি সাংঘাতিক দৃশ্য। দূরে মস্ত একখানা জাহাজ সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মতো পাক খেতে খেতে হাওয়ার তোড়ে পারের দিকে ছুটে আসছে। একবার লাফ মেরে সে ঢেউয়ের মাথার উপর ঠেলে উঠছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউয়ের তলায় কোন্ গভীর পাতালে গিয়ে লুকোচ্ছে। জাহাজটিকে আর জাহাজ বলেই চেনা যায় না। ঢেউয়ের ধাক্কায় তার গোটা কাঠামো-খানাই প্রায় চুরমার হয়ে গিয়েছে। খোলখানা কোনোরকমে তখনো ভেসে আছে। মাস্তুলের কাঠ-কুটো ভেঙে-চুরে তছনছ, পালগুলো ছিঁড়েছুঁড়ে ফালাফালা, খোলখানাও জল ঢুকে একপাশে কাৎ হয়ে প্রায় ডুবুডুবু; যে-কোনো মুহূর্তে জলের তলায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

জাহাজখানা মনে হয় বিদেশি, হয়তো ইংলণ্ডেরই কোনো বন্দরে ভিড়বে বলে বেরিয়েছিলো। প্রচণ্ড তুফান তাকে মাঝপথে কুটোর মতো লণ্ডভণ্ড করে এইভাবে ইয়ার-মাউথের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছে। কিন্তু পারে এসেও যে সে বাঁচবে সে ভরসা নেই। যেটুকু এখনো বাকী আছে সেটুকুও মাটির সাথে ধাক্কা খাওয়া মাত্র খোলাম-কুচির মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। চিন্তা করতেও গা শিউরে ওঠে।

জাহাজটিতে লোকজন কেউ বেঁচে আছে বলে মনে হয় না। হয়তো অনেক আগেই তারা ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছে। শুধু দেখা যাচ্ছে জাহাজের উপর থেকে জলের দিকে মারাত্মকভাবে হেলে পড়া একখানা ভাঙা মাস্তুলের ডগায় কোনোমতে ঝুলে আছে একটি মানুষ। হাত নেড়ে চিৎকার করে কি যেন সে বলছে, কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়ায় তার একটি শব্দও এখানে এসে পৌঁছুচ্ছে না।

দরজা খুলে আমি ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ দেখি হ্যাম। একমাথা এলোমেলো চুলে, উদ্‌ভ্রান্ত চোখে পাগলের মতো সে বালুর উপর ছুটোছুটি করছে। আমার দিকে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো, 'নমস্কার মাস্টার ডেভি! দেখুন অবস্থা। অসহায় মানুষটিকে কিভাবে বাঁচানো যায় তাই ভাবছি। সেই ফিকিরেই ঘুরছি।'

আমি বললাম, 'তুমি?- একা? এই দুরন্ত ঝড়ে? অসম্ভব।'

সে বললো, 'তবু হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না! যা হোক কিছু একটা করতেই হবে!'

আমি বললাম, 'পাগলামি করো না। এ দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মাঝখান থেকে নিজের জীবনটি যাবে।'

অদ্ভুত একটি ম্লান হাসি হাসলো সে: 'মৃত্যু তো একদিন হবেই স্যার! আজই যদি হয়, ক্ষতি কি? প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। ঐ দেখুন।'

দেখলাম জাহাজখানা অনেক কাছে এসে পড়েছে। মাঝামাঝি জায়গায় ভেঙে এখন সে প্রায় দুখণ্ড। বারো আনাই জলের তলায়। বাদ-বাকীটুকুও ডুবে যেতে আর দেরি নেই। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এবার দেখা গেলো কয়েকটি যাত্রী তখনো বেঁচে আছে। যে যা পেরেছে আঁকড়ে ধরে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাচ্ছে। দেখতে দেখতে সর্বনাশা ঢেউয়ে তাদেরও দুএকজন ভেসে চলে গেলো।

এবার সেই মাস্তুলের মাথায় ঝুলে থাকা মানুষটিকে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাথা ভর্তি লম্বা লম্বা লালচে কোঁকড়া চুলের রাশ হাওয়ায় উড়িয়ে সে সমানে চিৎকার করে চলেছে। টকটকে একটি লাল টুপি মাথা থেকে উড়ে গিয়ে গলার সঙ্গে ফিতে বাঁধা অবস্থায় শূন্যে দুলছে। এ রকম চুল, এরকম টুপি, লম্বাটে শরীরের এ রকম আদল, এমন হাত নাড়ার ভঙ্গী খুবই যেন চেনা-চেনা, আমারই বহুদিনের কোনো পুরোনো বন্ধুর মতো, কিন্তু তখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

হঠাৎ 'গেলো গেলো' বলে পারের হাজারখানেক মানুষ একসঙ্গে ককিয়ে উঠলো। আকাশ ছোঁয়া একটি প্রকাণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজখানা এবার সত্যি সত্যি দুটুকরো হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই হতভাগ্য মানুষ ক'টিও শেষবারের মতো এক করুণ চিৎকার তুলে এক নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। পার থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে সেই ছিন্নভিন্ন জাহাজের ডুবন্ত টুকরো দুটি তখনো এলোপাথাড়ি ভাসছে আর পারের দিকে ছুটে আসছে।

হ্যাম-এর দিকে ঘুরে দেখলাম, একধারে লোহার আংটা লাগানো মস্ত একখানা শণের দড়ি কোমরে জড়িয়ে সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। দড়ির আর একধার পারে দাঁড়ানো কয়েকটি জোয়ান মানুষের হাতে। নিমেষমধ্যে ডান হাত দিয়ে বুকে ক্রুশ

এঁকে সেই উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অনেকে 'হাঁ হাঁ' করে উঠলো। ডুকরে কেঁদে উঠলো। অনেকে বললো, নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু হ্যাম-এর কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। দুহাতে ঢেউ কাটতে কাটতে সে এগিয়ে চললো। কিন্তু এ কি মানুষের সাধ্য? ছোট্ট একটি কুটোর মতন একবার সে ঢেউ-পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠছে, পর মুহূর্তেই তার খাদ গড়িয়ে পাতাল-গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ তাকে দেখা গেলো না। হঠাৎ আবার যখন চোখে পড়লো তখন সে প্রায় জাহাজটির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। আংটা-বাঁধা দড়ির মাথাটি এবার সে ভাসন্ত অবস্থায়ই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জাহাজের কিনার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো। মনে হলো বুঝি রেলিং-এ গিয়ে আটকালোও। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই আর একটি বিশাল ঢেউ দড়ি সমেত তাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের টুকরো দুটিও ভুশ করে সেই যে তলিয়ে গেলো আর ভেসে উঠলো না।

আমার হৃৎপিণ্ড যেন অসাড় হয়ে গেলো। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ অনেক লোকের কান্নার আওয়াজে আমার চেতনা ফিরে এলো। দেখি পারের উপর প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়া একটি বিরাট ঢেউ হ্যাম-এর মৃতদেহ বালুর উপর এনে ফেলে দিয়েছে। তাঁর মাথার একপাশটা ভেঙে থেঁৎলিয়ে রক্ত-মাংসে বীভৎস হয়ে আছে। বাঁ চোখটি অবিকৃত। সেটি আধ-বোজা। যেন লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে সবাইকে বলছে, বিদায়, চিরদিনের জন্য বিদায়! অল্প হাঁ-হয়ে-থাকা মুখখানিতে কেমন যেন একটি করুণ তৃপ্তির হাসি! যেন বলতে চাইছে, এমিলি, তুমি সমুদ্রকে ভয় পেতে, এমন ঝড়ের দিনে তোমার কোমল বুকখানা অস্থির হয়ে উঠতো কোনো ডুবন্ত জাহাজের যাত্রী বা জেলে-নায়ের

মাঝিদের কথা ভেবে। তাদের উদ্ধার করে কূলে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে তুমি। আমাকেও তোমার সেই স্বপ্নের সাথী করে নিতে। এখন তুমি নেই। তবু শুনে সুখী হবে যে, পারুক না পারুক, তোমার হ্যাম অন্ততঃ চেষ্টা করেছিলো তোমার স্বপ্নকে সার্থক করতে! একটি প্রাণ অন্ততঃ বাঁচাতে!

সকলের সাথে আমিও ঝরঝর করে কাঁদছি, হঠাৎ কারা যেন এসে খবর দিলো, আর একটি মরা ভেসে এসেছে, ওখানে।

বহুলোকের সঙ্গে আমিও ছুটলাম সেদিকে। মৃতদেহটি ভিজে বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিলো। একজন তাকে ধরে চিৎ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠলাম। গলায় সেই লাল পশমের টুপিটি তখনো লেপটে রয়েছে। বড় বড় লাল চুলগুলো ভিজে জবজবে হয়ে সমস্ত মুখে ছড়ানো। চোখ দুটি বোজা। আমার সালেম হাউস-এর সেই বহুদিনের বাল্যবন্ধু জেম্‌স্ স্টিয়ারফোর্থ!

১১

মনের শান্তির আশায় ইয়ার-মাউথে গিয়েছিলাম, ফিরে এলাম দুটি শোচনীয় অকালমৃত্যুর মর্মান্তিক দাহ বুকে নিয়ে। চলে গেলো স্টিয়ারফোর্থ তার নির্বোধ অপকর্মের শেষ প্রায়শ্চিত্ত করে, চলে গেলো উদার-হৃদয়, সরল-প্রাণ হ্যাম তার ব্যর্থ ভালোবাসার দুরন্ত অভিমান বুকে নিয়ে।

স্মৃতির অনির্বাণ শিখা মনে জ্বালিয়ে রেখে জীবনের আকাশ থেকে নিভে গেলো অনেক তারা, দূরে চলে গেলো অনেক প্রিয়জন।

শূন্য প্রাণে ইয়ার-মাউথ থেকে বিদায় নিয়ে বাতাসে উড়ন্ত শুকনো পাতার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দেশ থেকে দেশান্তরে আর

চোখের জলে কলম ডুবিয়ে লিখে যেতে লাগলাম আমার নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ জীবনের কথা ও কাহিনী। মাসের পর মাস ছাপা হতে লাগলো তা লণ্ডনের একটি বিখ্যাত পত্রিকায়। প্রশংসা পেতে লাগলাম অফুরন্ত, নাম-যশ হতে লাগলো চারদিকে, টাকাও আসতে লাগলো যথেষ্ট, কিন্তু অন্তরের শূন্যতা ভরলো না কিছুতেই। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো দাউ দাউ করে বুকে জ্বলতে লাগলো ডোরার স্মৃতি।

এইভাবেই কাহিনীর শেষ পর্বের দিকে এগিয়ে চললাম ক্রমশঃ। শূন্যতার অন্ধকারে একটিমাত্র স্নিগ্ধ আলোকরশ্মির মতো জ্বলতে লাগলেন আমার মমতাময়ী ঠাকুরমা, আর আমার মা-হারা জীবনের দ্বিতীয়া মা-মনি পেগটি। ডোভার থেকে চিঠির পর চিঠিতে তাঁরা আমার দগ্ধ প্রাণে শান্তির প্রলেপ বুলোতে লাগলেন। নিয়মিত টাকা-পয়সা দিয়ে আমার দেশ বেড়ানোর রসদ জোগাতে লাগলেন।

অনেক জায়গা ঘুরে অবশেষে সুইজারল্যাণ্ডে এলাম। এমন সুন্দর দেশ ইউরোপে আর নেই। ভাবলাম আর এখান-ওখান না করে এইখানেই কিছুদিন থাকি। হঠাৎ ব্লাণ্ডারস্টোন-এর এক চেনা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। তিনি আমার বাপের বয়সী। বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখানে এসেছেন। তাঁর মুখে শুনলাম, আমার নতুন বাবা আবার বিয়ে করে যে মহিলাটিকে ঘরে এনেছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি নাকি আমার নতুন পিসী ও তাঁর অত্যাচারের ফলে মাথা খারাপ হয়ে এখন কোন্ এক পাগলা গারদে আছেন। শুনে ক্ষোভে, দুঃখে, বিরক্তিতে ও ঘৃণায় সেই হৃদয়হীন মানুষ দুটির উপর মন এমনভাবে বিষিয়ে উঠলো যে, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে হলো না।

ঠিক এমন সময়েই হঠাৎ অ্যানিস-এর চিঠি পেলাম। দীর্ঘ দিনের দুঃসহ, নিরানন্দ শীতের পরে বসন্তের রঙীন হাওয়ার মতই সেই চিঠি আমার শূন্য জীবনে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ এনে দিলো।

অনেক কথাই সে লিখেছে। কথার পর কথা সাজিয়ে সে কোনো শুকনো উপদেশ বা নিষ্প্রাণ প্রবোধের মালা গাঁথেনি, বরং অত্যন্ত সরল কথায় আমার জন্য তার অন্তরের সবটুকু স্নেহ, ভালোবাসা ও আকুলতা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। দুঃখে চোখের জলও যেন শুকিয়ে খাঁক হয়ে গিয়েছিলো, অনেক দিন পর এ চিঠি পড়ে নিজে থেকেই তা আবার বন্যাধারার মতো দুচোখে নেমে এলো।

অ্যানিস। অ্যানিস! নামটি সুন্দর। স্বপ্নের মতো মোহময়। কিন্তু সে তো আমার নয়। একদিন হতেও পারতো হয়তো! কিন্তু আজ সেই আশা আকাশ-কুসুমের মতোই অলীক। মিথ্যা আশার মায়াজাল বুনে আর লাভ কি? তার চেয়ে আমার জীবনে শুধু একটি মিষ্টি-মধুর স্মৃতি হয়েই থাক সে।

* * *

দীর্ঘ তিনবছর এইভাবে নিরুদ্দেশের পথে ঘুরে ঘুরে একদিন আবার লণ্ডনে ফিরে এলাম। ইচ্ছে হলো স্টিয়ারফোর্থ-এর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। ছেলের শোকে কাতর সেই মহিলাটির ওপর কেমন যেন একটি মমতা জেগেছিলো মনে। তা ছাড়া মিস্ ডার্ট্ল্-এর প্রতিও একটু অনুকম্পা। গিয়ে দেখলাম মিসেস্ স্টিয়ারফোর্থকে প্রায় চেনাই যায় না; সেই স্বাস্থ্য নেই, রঙ নেই, চোখমুখের সেই উজ্জ্বলতা নেই, শক্ত-সমর্থ, দীঘল শরীরও যেন অনেকখানি নুয়ে পড়েছে, চুলগুলো শণের মতো শাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু যেন তিনি ভাগ্যের কাছে হার মানেন নি এমন একটি ভাব নিয়ে আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইবার চেষ্টা করলেন।

ছেলের মৃত্যুর সময় আমি যে সেখানে উপস্থিত ছিলাম সে খবর তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তা ভাঙলেন না বা সে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন না, বরং কথায় কথায় আমার মুখে

দু'একবার স্টিয়ারফোর্থ-এর নাম বেরিয়ে আসায় অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, 'খবরদার ডেভিড, ওর নাম ভুলেও যেন আর কখনো আমার সামনে উচ্চারণ করো না। কোনোদিন হয়তো সে আমার ছেলে ছিলো ; আজ আর কেউ নয়।' বলতে বলতে হঠাৎ যেন তার চোখের কোণ ভিজে উঠলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঢোঁক গিলে, কাঠ হয়ে আবার গম্ভীর সেজে বসে রইলেন।

রোজা ডার্ট্‌ল্ একবারও কাছে এলেন না। আড়াল-আবডাল থেকে আড়চোখেই আমাকে এক-আধটু যা দেখলেন। তাঁরও সমস্ত মুখে বিষাদের একটি কালো ছাপ। মেজাজও খুবই খিটখিটে হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। তবু তারই মধ্যে ভাঙবো-তবু-মচকাবো না গোছের কেমন যেন একটু গরবিনীর ঠাট বজায় রেখে দূরে দূরেই রইলেন। বেরিয়ে আসার সময়ও অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কোনো কথা কইলেন না।

পরদিনই ডোভারের উদ্দেশে রওনা হলাম।

ঠাকুরমার বুকে মুখ রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। পেগটি মূর্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার মতো কাছে এসে দাঁড়ালো। তার পরিবর্তনই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সেই রাঙা টুকটুকে ফুলো-ফুলো গাল দুটি শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। নাদুস-নুদুস শরীরটিরও সেই দশা। চোখে ভালো দেখতে পায় না। চশমা পরে যেন সাতবুড়ির এক বুড়ি হয়ে গিয়েছে একেবারে।

দুটি স্নেহময়ীর আদর-যত্নে কয়েকদিন কাটলো। এবার কাজে-কর্মে মন না দিলে নয়। আইন-ব্যবসা, রিপোর্টারী সবই শুরু করতে হবে। বই লিখেও মোটা টাকা পাচ্ছি। তাও চালিয়ে যেতে হবে। ঠাকুরমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। সমাজে দশজনের একজন হয়ে উঠেছি। সেই ডোভার, সেই লণ্ডন, সেই ক্যান্টারবেরী সবই আছে, কেবল ডোরা নেই।

একদিন ঠাকুরমা বললেন, 'হ্যারে, চল্ না একবার ক্যান্টারবেরী থেকে একটু ঘুরে আসি।'

—'ক্যান্টারবেরী! কেন?'

ঠাকুরমা বললেন, 'বিশেষ দরকার। অ্যানিসের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে।'

কয়েকদিন পরেই পেগটিকে নিয়ে তিনজনে ক্যান্টারবেরী এসে পৌঁছলাম। এ শহরের প্রতিটি গলি-ঘুঁজি এমন কি পথের প্রতিটি পাথরের টুকরোও আমার চেনা। শুধু চেনা নয়, বহুদিনের একটি মধুর স্মৃতির সৌরভে ভরা। বেড়াতে বেড়াতে একসময় আমরা উইকফিল্ড-এর সেই পুরোনো বাড়িতে এসে হাজির হলাম। আজ আর ইউরিয়া হিপ নেই। তার বদলে ডাগর দুটি সুন্দর নীল চোখ একতলার সেই গোল ঘরটির জানালা দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

এক নজরেই চিনলাম: অ্যানিস। অত দুঃখের মধ্যেও আনন্দে বুকখানা দুলে উঠলো। ঠাকুরমা কি তবে খবর দিয়েই এসেছেন? অ্যানিস কি আমাদেরই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলো?

ভেতরে ঢুকে কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। একটি নতুন পরিচারিকা আমাদের উপরে নিয়ে চললো। দোতলায় আগের আপিস-ঘরটি এখন বৈঠকখানা। খাতাপত্র, আলমারি কিছুই নেই। মিকাবরের শূন্য চেয়ারটি এক কোণে পড়ে আছে। সেই ঘরেই বসলাম। একটু পরেই উইকফিল্ড এলেন। তাঁরও শরীর ভেঙে-চুরে অনেক পাল্টে গেছে। তবু আগের সেই বিশ্রী চেহারা এখন অনেকটা ভালো। অনেক দিন পর সত্যিকার মনের শান্তি তিনি ফিরে পেয়েছেন।

আমাকে দেখামাত্র তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'দুঃখ করো না কপারফিল্ড! দুঃখ যিনি দেন, দুঃখ সইবার

শক্তিও তিনি দেন। তা ছাড়া ভেঙে পড়ে তো কোনো লাভ নেই, যে চলে গিয়েছে সে তো আর ফিরে আসবে না। তার চেয়ে আশায় বুক বেঁধে আবার নতুন করে জীবন শুরু করো। তুমি সৎ ও চরিত্রবান্। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমার সামনে।'

এ সব কথা কিসের ইঙ্গিত? কি বলতে চান মিঃ উইকফিল্ড?

তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'অ্যানিসই এখন আমার একমাত্র ভাবনা। কখন চোখ বুজবো কে জানে? ওর উপযুক্ত একটি যোগ্য পাত্রে ওকে দিয়ে যেতে না পারলে মরেও আমি শান্তি পাবো না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ আমার হাতখানা চেপে ধরে তিনি গভীর স্নেহের সুরে বললেন, 'ডেভিড, তুমি ওকে গ্রহণ করো। আমি জানি সেও তোমাকে ভালবাসে। ডোরাকে ফিরে পাবে না ঠিকই, কিন্তু ওকে নিয়ে তুমি সুখী হবে।'

আনন্দে আমার দুচোখ জলে ভরে উঠলো। এও কি সত্যি? এই শূন্য জীবনে অ্যানিসের মতো রত্ন-মেয়েকে পাবো? উইকফিল্ড আমাকে তাঁর মেয়ের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে বসে ঠাকুরমা ও পেগটির সাথে গল্প করতে লাগলেন।

কতদিন পরে অ্যানিসকে দেখলাম! ঘরের কোণে জানালার ধারে বসে সে সেলাই করছিলো। আমাকে দেখে উঠে এসে ধীরে ধীরে আমার সামনে দাঁড়ালো। মুখে কাতরতা, চোখে করুণা, তারই মধ্যে কোথায় যেন একটু গোপন আনন্দের ঝিলিক তার মনে। হাতখানা ধরে সযত্নে সে আমায় তার পাশের আসনটিতে নিয়ে বসলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো, 'কেমন আছো ডেভিড?'

আমি বললাম, 'দেখতেই পাচ্ছো। কোনোমতে বেঁচে আছি মাত্র!'

মমতাভরা স্নিগ্ধ চোখদুটি এবার সে পুরোপুরি আমার চোখের ওপর রাখলো। ইচ্ছে হচ্ছিলো সেই মুহূর্তে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরি। বলি, 'অ্যানিস, তুমি আমার হবে?' কিন্তু মুখ দিয়ে কথা

বেরোলো না। কোনো মতে বললাম, 'আমার কথা তো শুনলে, এখন বলো তুমি কেমন আছো ?'

'আমি ?' মিষ্টি করে একটু মলিন হাসি হাসলো সে : 'আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। চাল-চুলো না থাক, শান্তি আছে। বাবার জন্য বুকে যে পাষাণ-ভার ছিলো, তা নেমে গিয়েছে। দুজনেই যেন জীবন পেয়েছি। তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারবো না ডেভিড, কোনোদিন না, মানে তোমার ভালোবাসার ঋণ…'

অ্যানিসের ঠোঁট দুটি থর থর করে কাঁপছে। আরো কি যেন সে বলতে চায়। তার কোমল হাত দুখানা মুঠোর ভেতর তুলে নিয়ে আমি বললাম, 'থেমো না অ্যানিস, কি বলছিলে বলে যাও…'

টস টস করে দুফোঁটা চোখের জল তার গাল দুটি বেয়ে গড়িয়ে পড়লো : 'শুনবে ডেভিড ? জানি না আমার সেই সাধ পূর্ণ করবে কিনা।…তোমাকে আমি ভালোবাসি…আজীবন বেসে এসেছি, যদিও মুখ ফুটে কখনো কিছু বলিনি, এখন চিরদিনের মতো তোমার পাশে থেকে আমি তোমার ডোরার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে চাই ডেভিড ! তার স্থান হয়তো পূর্ণ করতে পারবো না, তবু কিছুটা শান্তি তো দিতে পারবো !'

'অ্যানিস ! অ্যানিস !' অভিভূতের মতো আমি তার জলভরা কাতর মুখখানা বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম।

বললাম, 'এতো আনন্দ যদি আমি সইতে না পারি অ্যানিস ! যদি ডোরার মতো তোমাকে ভালোবাসতে না পারি ?'

প্রশান্ত গলায় অ্যানিস বললো, 'কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সে দাবিও আমি করবো না। আমি শুধু তোমাকে ভালোবেসেই সুখী হতে চাই ডেভিড। ডোরা বেঁচে থাকলে জীবনে আমি বিয়েই করতাম না। সে নেই বলেই, তারই অনুরোধে এতোদিনের লুকোনো ভালোবাসা নিয়ে আজ তোমার কাছে এসে ধরা দিয়েছি।'

—'কি বলছো অ্যানিস?'

অ্যানিসের চোখ ছাপিয়ে ঝরঝর করে জল নেমেছে: 'ঠিকই বলছি। ডোরা তার মৃত্যুর সময় তোমাকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছে। বলে গেছে, বোন! ইচ্ছে ছিলো না যে মরি। বড় সুখে ঘর বেঁধেছিলাম দুজনে, কিন্তু ঝড়ে ভেঙে গেলো। প্রিয়তম স্বামীকে অসহায় ফেলে চললাম। আমি তাকে সুখী করতে পারিনি। তুমি তার ভার নিও, তাকে সুখী করো। ওপারে বসে তা হলেই আমি শান্তি পাবো।'

হৃদয়খানা দ'লে মুচড়ে, ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেলো। ডোরা, ডোরা, এতো ভালো তুমি আমায় বাসতে? আমার চির সোহাগিনী, চির-দুঃখিনী বালিকা-বধূ! এতো সুন্দর তোমার প্রাণ?

অ্যানিস তার ছোট রুমালখানা দিয়ে সস্নেহে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আমাকে তোমার সেই চির আদরিণী বালিকা-বধূর ছায়া বলেই মনে করো ডেভিড! তারই মুখ চেয়ে আমাকে শুধু তোমার সেবার অধিকারটুকু দাও। এর বেশি কিছু চাই না।'

দুজনের বুকে মুখ রেখে দুজনেই কাঁদছি। একটি অতল দুঃখ আর একটি অপরূপ সুখ যেন গলাগলি হয়ে আমাদের দুইটি হৃদয়কে এক আশ্চর্য শান্তিতে এক করে দিয়েছে।

* * *

ডোরার সাথে মিলন হয়েছিলো হাসি, আনন্দে, উৎসবে, আড়ম্বরে আলোক-সজ্জায়, বহু অতিথি-অভ্যাগতের ভিড়ে-উপচে-পড়া গির্জার মন-মাতানো ঘণ্টা-ধ্বনিতে। অ্যানিসের সাথে মিলন হলো দুঃখে, বিষণ্ণতায়, আড়ম্বরহীন সামান্য অনুষ্ঠানে, অল্প কয়েকটি মাত্র অতিথি-অভ্যাগতের সামনে, অল্প-আলোকিত গির্জার বেদীতলে উদাস, ক্ষীণ ঘণ্টাধ্বনিতে। সমস্তক্ষণ কেবল ডোরার কথাই মনে

হচ্ছিলো, সেই স্মৃতিই চোখে ভাসছিলো। সেই অভাগিনী বালিকা-বধূটির জন্যই চোখের জলে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে উঠছিলো। অ্যানিসকে মনে হচ্ছিলো ডোরা। ডোরাই যেন অ্যানিস হয়ে এসেছে। অ্যানিস যেন ডোরার সাথেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

* * *

নতুন জীবনের যাত্রাপথে আজো সেই বিভ্রম আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে। অ্যানিসকে তাতে এক নতুন রূপে দেখছি, যা আমার জীবনকে স্বপ্নময়, মোহময়, নিত্য আনন্দময় করে রেখেছে।

ঠাকুরমা এখন আর ডোভারে নেই। এখানে, আমার কাছেই থাকেন। স্নেহে-ভালবাসায় তিনি আমায় অষ্টপ্রহর ঘিরে রয়েছেন। আর আছে চির মমতাময়ী পেগটি, আমার মায়ের দ্বিতীয়া প্রতিমূর্তি। এখনও তার কাছে আমি সেই ছোট্ট ডেভি। নাকের গোড়ায় চশমা এঁটে আগুনের ধারে বসে একমনে সেলাই করতে করতে এখনও সে আমাকে গল্প শোনায়,—আমার ভাগ্য-হীন মায়ের গল্প, অকালে মরে যাওয়া আমার বাবার গল্প, ব্লাণ্ডারস্টোন-এর পুরোনো দিনের গল্প, আরো কত কি!

যারা চলে গেছে, তাদের আর পাই না। যারা কাছে আছে তারা আসে। আসে প্রিয়তম বন্ধু ট্রাড্‌ল্‌স্‌ আর তার মিষ্টি বউ সোফি, আসেন উইকফিল্ড, সপরিবারে ডক্টর স্ট্রং। আলাপে-আপ্যায়নে, গল্পে-গুজবে, খেলাধুলায়, ভ্রমণে, চড়ুইভাতিতে দিনগুলো তরতর করে কাটে, কখনো দ্রুত কখনো ঢিমেতালে। কাজে-কর্মে, লেখায়, নামে, যশে, অর্থে আজ আমার সংসারটি পয়মন্ত। কিন্তু এতো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দের মধ্যেও এক একদিন মনটা হুহু করে ওঠে, মনে হয় সবার মধ্যেও আমি যেন বড় একলা, সব থেকেও কি যেন নেই, কে যেন চিরদিনের জন্য এই আনন্দের হাট থেকে চলে গিয়েছে, আর ফিরে আসবে না। হুহু করে চোখ বেয়ে জল নামে, 'ডোরা, 'ডোরা,'

বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি, মায়ার পুতুলটির মতো পাশে এসে দাঁড়ায় অ্যানিস। চোখের জল মুছিয়ে, বুকে আগলে সান্ত্বনা দেয়। জল-ঝাপসা চোখে সেই মুহূর্তে তার আদুরী মুখখানার দিকে চেয়ে সত্যি মনে হয়, না, না, সে তো হারায়নি, এই তো আমার ডোরা, এই তো আমার সেই প্রথম ভালোবাসার বালিকা-বধূটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

অ্যানিস যতদিন থাকবে ততদিন কোথাও সে হারিয়ে যাবে না। বুকখানা ভরে চিরদিন সে আমার কাছে থাকবে।

শেষ